তৃতীয় অধ্যায়

আশালতা সিংহের গল্প সমূহ

ব্যক্তিগত বোধ এবং তার প্রকাশই সাহিহত্যের প্রাণ। একজন লেখক সাদা কি কালো, দলিত কি উচ্চবর্ণ, পুরুষ নাকি নারী-তার সেই সামাজিকস্থিতি থেকেই সেই বিশেষ দৃষ্টি থেকেই লেখা তৈরী হয়ে ওঠে। এই কথাগুলো বিশেষভাবে সত্য আমাদের আলোচ্য শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা সম্বন্ধেও। প্রান্তবর্তী করে রাখা বাংলা সাহিত্যের সেই অসাধারণ শক্তিময়ী লেখিকার ক্ষেত্রে সমাজের নানা স্তরের পিতৃতান্ত্রিক পীড়নও যেমন বেদনাদায়ক বাস্তব, একইভাবে সত্য তাঁর রচনা গল্পে ছত্রে ছত্রে একজন নারীর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ত ছাপ যার দরুন সেই শক্তিময়ী লেখিকার গ্রন্থ সাত-আট দশকের কালের ধুলো সরিয়েও তা ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

আশালতা সিংহের লেখা গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় জীবন সম্পর্কে সমাজে নারীপুরুষের কিছু বাস্তব বুনিয়াদ ও তার মধ্যে অধিকারে নারীর যথার্থ অবস্থান চিহ্নিত করাই তাঁর গল্পগুলির মূল সুর।

আশালতা সিংহের লেখা যে দুটি গল্প সংকলন বের হয়েছে তার মধ্যে প্রথম গল্প সংকলনের প্রথম গল্প **'অভিমান'**।

'অভিমান' গল্পের শুরুতেই যে ছেলেটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন তার নাম কিরণ। সে তার আর পাঁচজন বন্ধুদের থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নিজেকে। স্বভাবতই সে তার চালচলন, কথাবার্তা, চিন্তাভাবনায় নতুন কিছু আমদানি করতে চায়। কোন বিষয় নিয়ে আালোচনা-সমালোচনা করবার সময় সে তর্ক না করে বরং হেঁয়ালী করে কিংবা দৈবের দোহাই দিয়ে মৃদুমন্দ হাসিতে সেই তর্কের পাশ কাটিয়ে দূরে সরে যায়। প্রকৃতপক্ষে সে যে তার বন্ধুদের থেকে অনেকটাই উঁচুতে অবস্থান করছে, একথাই সে বারে বারে নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টায় থাকে। এই অনন্য হবার দৌড়ে কিরণ একদিন তার বন্ধুদের বলে বসে, যাকে সে ভালবাসবে তাকে সে এক দেখাতেই সহস্র লোকের ভিড়েও চিনে নিতে পারবে। এরজন্য কোনরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এরপরেই গল্প অন্যদিকে মোড় নেয়। বন্ধু সতীশের সঙ্গে মায়ের অনুরোধে একরকম জোর করেই সে কনে দেখতে যায় অথচ কনে দেখার ইচ্ছে তার মোটেও ছিল না। ফল যা হবার তাই হল। যে মেয়ে তার যথাযোগ্য তাকে সে হেলায় হারাল। এদিকে বন্ধু সতীশের মেয়েটিকে পছন্দ হওয়ায় এবং সে মেয়েটির অভিভাবকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখে। এরপর নির্জন পাহাড় বনানীতে যখন কিরন মায়া

নাম্নি মেয়েটিকে আলাদা করে দেখে তখন কিরণের ভুল ভাঙ্গে; অভিমানিনী ব্যক্তিত্বময়ী মায়ার পূর্ণ পরিচয় পায় সে। ঘটনাক্রমে সতীশেরও মনে হয় সে যেন কিরণের অপছন্দ করা পাত্রীকে বিবাহ করে ঠকতে বসেছে। সুতরাং সেও অবিলম্বে মায়ার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

আপাতদৃষ্টিতে গল্পটিতে মধুরেণ সমাপ্তি ঘটিয়ে কিরণের ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা দেখানো হলেও মায়া-ই এ গল্পের প্রধান নিয়ন্ত্রক। সে যদিও সাধারণ বাঙালী মেয়ে তবু তাকে নিয়ে একবার কিরণের একবার সতীশের খেলা মায়ার আত্মাভিমানে আঘাত দেয়। সে মুখে কিছু না বললেও সতীশের প্রতি তার মন কখনওই অনুকূল ছিল না তবুও সতীশের প্রত্যাখ্যানের প্রকাশে তার হৃদয় বেদনাহত হয় এই ভেবে যে এই দুই পুরুষ তাকে খেলার পুতুল ভেবে তার ব্যক্তিত্বকেও যথেষ্ট লাঞ্ছিত করেছে। কেউ খেলায়বশত তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, কেউ আবার তখন তাকে উদ্ধার করতে আসবে, আবার পরক্ষণে অন্যের উচ্ছিষ্ট ভেবে তাকে ত্যাগ করবে ফলে তার অভিভাবকেরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। তাকে নিয়ে এই খেলায় সে রীতিমতো বিরক্ত ও বিপন্ন বোধ করে। পার্বত্য প্রকৃতির মাঝখনে গোধূলি বেলায় মায়ার সঙ্গে কিরণের যখন দৈব সংযোগ ঘটে এবং সেই সঙ্গে মায়ার পায়ে পাথরকুচি ফুটে রক্তক্ষরণের সময় কিরণ বলিষ্ঠ হাতে মায়ার ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে তখন মায়ার অভিমানী দৃষ্টি এক নিমেষের জন্য কিরণের দিকে পড়ে। তারপরই মায়া মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মুহূর্তে কিরণ মায়ার যথার্থ পরিচয় পায়। এক্ষেত্রে মায়া বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেনি ঠিকই কিন্তু দুই পুরুষের খামখেয়ালীপনায় সে যে রীতিমত বিরক্ত সেকথা মায়া বুঝিয়ে দেয়।

'নিরুপম' — আশালতা সিংহের লেখা নিরুপম গল্পটি একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প।

নিরুপম গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নিরুপম একুশ বছর বয়সী এক খ্রীষ্টান যুবক। পেশা শিক্ষকতা। নম্র, বিনয়ী, লাজুক প্রকৃতির এই ছেলেটিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে সহকর্মীরা প্রত্যেকেই শুধু ব্যবহার করেছে। ধনী সন্তান হিন্দু ঘরের ছেলে বীরেন শুধুমাত্র নিঃস্বার্থভাবে নিরুপমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যদিও বীরেন তাদের হিন্দুবাড়িতে নিরুপমকে কখনো নিয়ে আসেনি। স্কুলে চাকুরী করা ছাড়াও অর্থকষ্টের জন্য নিরুপম টিউশুনিও করে। নিরুপম একসময় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু আত্মহত্যা সে করে না। নিরুপম নিজেকে ভোলায়, সে নিজেকে প্রবোধ দেয় এই বলে যে, সেই মেয়েটি হয়তো কোনদিন তার ঘরে আসবে অতএব প্রতিদিন নিরুপম তার ঘরটি পরিপাটী করে সাজিয়ে গছিয়ে রাখে। এরপর বন্ধু বীরেনের নববিবাহিতা স্ত্রীকে দেখে তার ভুল ভাঙল। সে ঠিক করে এখন থেকে সে শুধুমাত্র নিজের জন্যই বাঁচবে। নিরুপম বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে — ''কেবল চাই দুবেলা দু'টি ভাত খাব আর সুস্থদেহে বেঁচে থাকবে।''[১]

এত সামান্য চাওয়াও কিন্তু না মঞ্জুর হয়। বীরেন নিরুপমের বোনের চিঠিতে জানতে পারে যে সে মারা গেছে।

'স্বাধীনতা ও সম্মান' গল্পে হরিশ চপলা বসুর সঙ্গে বসে সন্ধ্যা কাটাতে পারে। চপলাদেবীর শিক্ষা-দীক্ষা-রুচির প্রশংসাও সে করে। কিন্তু যখনই পুরুষ হিসাবে তাকে তর্কে তার আঁতে ঘা লাগে তখনই তার চেতন থেকে অবচেতন সত্ত্বা পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষায়, নিজের সুখ-সুবিধা বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। আর এরই ফল তার অবচেতন মনের ঐ স্বপ্ন, যেখানে চপলা বসু বব্ কাট চুল ছেটে বিদেশী মেয়েদের মত সিগারেট খায় আর হরিশের বন্ধুদের হাসির খোরাক হয় অন্যদিকে হরিশের স্ত্রী চারুশশী আটপৌরে শাড়ি পড়ে ঘরে লক্ষ্মী পূজো করে এবং হরিশের বন্ধুদের শ্রদ্ধা-সম্মান পায়। আসলে হরিশের মত পুরুষেরা ভয় পায় কারণ নারীরা যদি তাদের চাওয়া পাওয়া, মান-মর্যাদা বিষয়ে সচেতন হয় তাহলে এদের মত পুরুষদের সুখের পথে কাঁটা পড়বে। তাই হরিশের ঠুন্‌কো আত্মসম্মান বড় হয়ে দেখা দেয় যখন চপলা বলে — ''তুমি নাই বা গেলে ঠাকুরপো, আজ চারু আমার সঙ্গে গেছিল।''[২] (প.১২৩) চপলা সুন্দরী, শিক্ষিত, রুচিবান — সে বিদেশী সিনেমা দেখতে ভালবাসে কারণ সেই সিনেমার সৌন্দর্য রস সে উপলব্ধি করতে পার। হরিশের স্ত্রী চারুশশী ঐ দিন চপলার সঙ্গে সিনেমায় যায় এই চারু যে চপলার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না — এ বোধও চপলার আছে তাই সে তাকে যথাস্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছওে দেয়।

হরিশ মেয়েদের দেখতে চায় সতীত্ব, স্বামী সেবা, প্রভৃতির বেড়াজালে অবরুদ্ধ থাকতে, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের স্বার্থে মেয়েদের ওপর চাপিয়েছে। চপলা যদি এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এসব না মানে তবে মোটেই তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেরা বিধান দেবার কেউ নয়। মেয়েরা এখন তাদের বিষয়ে কোনো গোঁড়ামি সহ্য করবে না। কাকে তারা দেহ দেবে আর কাকেইবা তারা মন দেবে এ তারা একবার নয়, দু'বার-নয় একশোভার নিজেরাই ঠিক করবে।

শ্রীমতী আশালতা সিংহের **'অন্তর্দ্ধান'** গল্পে দেখি অজিত চ্যাটার্জী একজন চরম রিয়্যালিস্টিক লেখক, যিনি কাউকে রেয়াত না করে লেখার পণ করেছেন। যার জন্য 'শনিবারের চিঠি' এবং সেইসঙ্গে বহুলোক অজিতের প্রতি খড়্গহস্ত। তিনি কিন্তু এসবের তোয়াক্কা না করে নিজেকে এযুগের একজন প্রতিভা বলেই মনে করেন। বহুলোক অজিতকে ধিক্কার দিলেও ছাত্রের দল অজিতের লেখায় মুগ্ধ। তাদের মতে — ''... চামসে পড়া মান্ধাতার আমলের নারী স্তুতি দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, শুনে শুনে মন ভোঁতা হয়ে গেছে, এই সময়েই দেশ প্রতীক্ষা করেছিল অজিতবাবুর সচেতন হাতের এই আঘাত।''[৩]

(পৃ. ১২৯) এহেন অজিত চ্যাটার্জী কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করল। অমিতাদেবী 'অজিত চ্যাটার্জী ও তাঁহার প্রতিভা' নাম দিয়ে যে সমালোচনা লিখলেন তাতে তিনি অজিতবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অমিতার স্বামী ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গেছে, সেই অবসরে বিহারের মুঙ্গেরে বাপের বাড়িতে থেকেই কোলকাতার লেখক অজিত চ্যাটার্জীকে অনুপ্রেরণা দানের দায়িত্ব নিয়েছেন। শুধু পত্রিকায় সমালোচনা নয়, ব্যক্তিগত চিঠি চলাচলের মাধ্যমে দুজনের মধ্যে যে বহু মিল তা তারা জানতে পারেন। এদিকে অবিবাহিত অজিত কল্পনায় অমিতাকে রূপ দেবার চেষ্টায় লেগে যায়। কল্পনায় দেখার কষ্ট থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পায় সে যখন অসিতার কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়া অ্যালডুস্ হাক্সলির বইয়ের পাতার ভাঁজ থেকে একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের ফটোগ্রাফ তার কাছে পড়ে যায়। এই সুন্দরী মেয়েটির ফটো দেখে অজিত ভেবেই নেয় যে এটা অমিতারই ফটো। ফল স্বরূপ অজিতের তৃতীয় উপন্যাসটি উৎসর্গ হয়ে যায় অমিতার নামে, দুজনের চিঠিপত্রেরর ধারাও ক্রমে পার্সোনাল হয়ে ওঠে। বোঝা যায় উভয়ের প্রত্যক্ষ দর্শনের দিন ক্রমেই নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। এরপরেই গল্প অন্যদিকে মোড় নেয়।

অমিতা তার বিরাট বাড়িতে যখন অজিতকে চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে আনে তখনই অমিতাকে দেখে অজিতের ভুল ভাঙ্গে। গেট দিয়ে ঢুকেই অজিত লনে তার চিত্ররূপিনীকে দেখে। কিন্তু সে যাকে দেখে সে আসলে অসিতার বোন অমিতা। আরও বিপদজনক ব্যাপার হল অসিতার মতো অমিতা মোটেই অজিতের লেখার ভক্ত নয়। অথচ অমিতার সেই আশ্চর্য সুন্দর ফটোটাই অজিতের কাছে অমিতার দামকে বাড়িয়ে তুলেছে।

অসিতা শুধু অজিতকে নয় আরও বহু সহিত্যিককে প্রেরণা যোগানোর দায়িত্ব নেওয়ায় চায়ের টেবিলে অন্যদের তুলনায় অজিত ক্রমেই বিরল হয়ে আসতে থাকে। অন্যদিকে অজিত অমিতার কাছে নিজের দোষ ত্রুটির সমালোচনা অতি মনোযোগের সাথে শুনতে যাতায়াত বজায় রাখে অসিতার বাড়িতে। অজিতের সঙ্গে অমিতার আলাপচারিতা অসিতার নজরে পড়ে এবং অসিতার অন্তরে স্বত্ব খোয়ানো নারীর আদিম ঈর্ষা জেগে ওঠে। অমিতার সূক্ষ্ম বোধ-বুদ্ধিতে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটি ধরা পড়ে এবং সে কাল বিকল্প না করে কোলকাতা থেকে পশ্চিমে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অসিতার দীর্ঘকালীন নারী লাবণ্য সে কাজ করতে পারেনি অমিতার ক্ষণকালীন কটাক্ষ এবং চিরকালীন প্রস্থানে সেই ঘটনাই চট্‌জলদি ঘটে যায়। অর্থাৎ অজিত চ্যাটার্জির সমস্ত উপন্যাস ও কবিতার বইয়ের মধ্যে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সেটি এই সময়েই তিনি লিখতে সক্ষম হন।

এই গল্পের মাধ্যমে আমরা অসিতা এবং অমিতা নামক যে দুজনকে পাই তারা দুজনেই আধুনিক নারীর প্রতিভূ। এর মধ্যে অসিতা যুগের হাওয়ার বিপরীতে গিয়ে অজিত চ্যাটার্জীকে প্রেরণা দান করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্য পড়েন, বোঝেন, তা নিয়ে অন্যকে উৎসাহ দান করেন। অমিতা অসিতার চেয়েও

আরও সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অসিতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সে খুব সুন্দরভাবে কাটিয়ে দিয়েছে উপরন্তু সে জানে কীভাবে খোঁচা দিয়ে প্রতিভাধর লোকের লেখায় আসল প্রতিভার উন্মেষ ঘটনো যায়।

এই গল্পে পুরুষ চরিত্র অজিত চ্যাটার্জীর তুলনায় অমিতা এবং অসিতা দুজনেই বেশি বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী।

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল' — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে বাবুরা 'দক্ষ কোকিলাহারী' অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পসত্ত্বার চেয়ে এরা রক্ত মাংসের শিল্পীর দেহকেই আত্মস্মাৎ করতে চান। অশালতা দেবীর 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল' গল্পে বাবুদের মার্জিত রূপ দেখি খানিকটা নীরেন এবং অনেকটা সীতেশের মধ্যে। এই গল্পে মিনতি ওরফে পুষ্পলতা প্রকৃত গুণগ্রাহী, আধুনিক মনের মানুষ। শিল্পীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় সে বিনম্রভাবে। তার জন্য মেয়ে হিসাবে তার এতটুকু কুণ্ঠাবোধ নেই। নীরেনের গান শুনে সে যখন মুগ্ধ হয় তখন সেই শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেয়ে বলে তার মধ্যে কোন দ্বিধা দুর্বলতা দেখা দেয়নি। একজন গুণ-মুগ্ধ শ্রোতা হিসাবে নিজেকে ভাবতে পেরেছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে একজন যুবক পুরুষের প্রতি একজন যুবতী মেয়ে হিসাবে তার আলাদা কিছু মনে হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী শ্রোতাটি পুষ্পলতা নামক এক মহিলা জেনেই নীরেনের হৃদয়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে পরিস্কার যে গুণমুগ্ধ ব্যক্তি মহিলা না হয়ে যদি পুরুষ হত তবে কিন্তু নীরেনের মনে এই ভাবের উদ্ভব ঘটত না। তখনও পর্যন্ত নীরেন পুষ্পলতাকে চোখে দেখেনি। শুধু তার থেকে একটি চিঠি পেয়েছে। এরপর নীরেনের বন্ধু সীতাংশু যে দুপুরে খাবার পর ফ্যানের নীচে শুয়ে তার নবলিখিত উপন্যাসটিকে নিয়ে ঘষামাজা করে তাতে 'ফাইনাল টাচ' দেবার উপক্রম করেছিল সে প্রথমে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' বেড়াতে যেতে রাজি হয়নি অথচ সেই যখন তরুণী মহলের একজন প্রতিনিধি স্থানীয়া পুষ্পলতার মুখে নিজের উপন্যাসের সামান্য প্রশংসা শুনল তখন তার মনে ভূমিকম্প নয় 'ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত' শুরু হল। এরপরে দুই বন্ধু পুষ্পলতাকে কেন্দ্র করে যেভাবে কান্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তার ফুলঝুরি ছুটিয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে তাতে পরিবেশ পরিস্থিতি রীতিমত লজ্জাজনক ও হাস্যকর হয়ে ওঠে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় দুই বন্ধুর এতেও লজ্জাবোধ হয় না। তাদের স্মম্ভিত ফেরে যখন তারা শোনে আসছে ফাল্গুনে পুষ্পলতার বিয়ে হবে ধনী অরবিন্দ দত্তের সঙ্গে। প্রগতিশীলতায় তথা মন-মানসিকতায় ছেলেরা যে মেয়েদের তুলনায় কতটা পিছিয়ে আছে শ্রীমতী আশালতা সিংহের এই 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' গল্পটি তার প্রমাণ।

'স্পেশালাইজেশন' — ছেলেদের খামখেয়ালিপনা কতদূর হাস্যকর এবং অবাস্তব হয় তার

একটা নিদর্শন আমরা আশালতা দেবীর 'স্পেশালাইজেশন' গল্পে পাই। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ যে কত ছেলেমানুষ হয় এবং সেই সঙ্গে অসম্ভব অহং-সর্বস্ব, তার প্রমাণ নরেশ যে মনের খেয়ালে স্পেশালাইজেশন-এর বিরোধিতা করে এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করবার জন্য সে ক্ষেপে ওঠে। এরপর সে যখন বিয়ে করবে না বলে স্থির করে তখন তার মা কৌশলে বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। বিয়ের পর সে যখন শান্ত হয়ে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করছে তখনও সে যে বন্ধুদের কথার খোঁচায় ক্ষেপে গিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনকে ভেস্তে বিলেত পর্যন্ত যেতে পারে, এধরনের আশঙ্কা তার স্ত্রীর হয়। নরেশ বিজ্ঞানী হলেও তার বাস্তব বুদ্ধির অভাব যথেষ্টই রয়েছে, তুলনায় স্ত্রী লীলা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। এর চেয়েও বুদ্ধিমতী বলব তার মা কে; যিনি উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে নরেশের বিবাহ দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে।

'পরাজয়' — আশালতা সিংহের লেখা এই গল্পটি ১৩৪০ ৮ই পৌষ ছোটো গল্প (সাপ্তাহিক)-এ ২বর্ষ /২৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গল্পের নায়িকা নলিনী। নলিনী এলাহাবাদে থাকে। নলিনীর পিতা শ্যামাচরণ ব্যানার্জ্জি এলাহাবাদে ওকালতি করেন। উনিশ বছরের নলিনী বি.এস.সি. পরীক্ষা দিয়ে পিতার বন্ধু শশীনাথবাবুর কাছে কোলকাতায় বেড়াতে এলো। শশীনাথ বাবুর মেয়ে মন্দালিকা, রমা, ছেলে নীরেন।

যুবক নীরেনের কথাবার্তা, বিচার বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষদের থেকে আলাদা। নীরেন মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লেখে। সেইসব প্রবন্ধে সে সমস্তকিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চুরচিরে বিশ্লেষণ করে। নীরেনের নীতিটা ওজস্বী এবং তেজোগর্ভ হলেও সত্য সত্য করে সে যেন ক্ষেপে উঠেছে। সত্যকে সে শুধু নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়নি, সকলের গয়ে পরে দুঃসহ বিরুদ্ধতায় সেই সত্য সে প্রচারও করে বেড়ায়।

নলিনীর সঙ্গে নীরেনের আলাপ হয়। নলিনী নীরেনকে তারই এই স্পষ্টবাদিতা এবং সত্যর জন্য খাতিরে সকলের গায়ে পড়ে ঝগড়া করার জন্য তাকে কটাক্ষ করে বলে কেন নীরেন সকল কাজে সকলের বিচারক সাজতে যায়। নলিনীর কথায় — ''বুদ্ধিবৃত্তির একটা দুর্লভ কাঠিন্য না হয় অপনার আছে, না হয় আমারও আছে, কিন্তু সেইজন্যই অহর্নিশি লোকের সস্তা রূচি এবং সাধারণ দোষত্রুটি র বিচার করে বেড়াতে হবে এমন পরোয়ানা আমরা কোথাও পেলুম।''[৪]

এরপর নলিনীর প্রভাবে ধীরে ধীরে নীরেনের মধ্যে পরিবর্তন আসে। সে আর মাসিক পত্রে খুব জোড়ের সঙ্গে সত্য প্রচার করার জন্য ক্ষেপে ওঠে না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তথা চেনা পরিচিতরও মাঝে সে আর অসহনীয় হয়ে দূরে থাকে না। এরপর নীরেন অসুস্থ হলে নলিনীর সেবায় তার সাহচর্যে

সে আরো মুগ্ধ হয়। নীরেনের বাড়ির লোকেদেরও তাদের এই সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন অনুমোদন থাকে। বোঝা যায় এর পরে নীরেন নলিনীকেই তার জীবনসঙ্গিনী করে বা কি জীবনটা অতিবাহিত করবে।

এখানে নীরেনের তুলনায় নলিনী অনেক বেশি বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী যে নীরেনের মতো ঋজু প্রকৃতির, স্পষ্টবাদী, চরমপন্থী যুবককেও নিজের প্রভাবে বিনয়ী নম্র করে তুলেছে।

'অন্তর্যামী' — বড়ো গল্পের সমাহারে গ্রন্থিত 'অন্তর্যামী গল্পগ্রন্থের' (১৯৩৫) প্রথম গল্প এই 'অন্তর্যমী' গল্পটি। গল্পটির নায়িকা অমলা। অমলার বিয়ে হয় অমিয়র সঙ্গে। বিয়ের পূর্বে অমিয়র সঙ্গে তার বন্ধু সুকুমারও অমলাদের বাড়িতে গিয়েছিল। সুকুমার কবি। সুকুমারের লেখা কবিতা, আচরণ — সবই বিবাহিত অমলার কাছে বিরক্তিকর — অন্তত একথাটাই অমলা খুব জোরের সঙ্গে সকলের সামনে প্রমাণ করতে চায়। সুকুমার তার কবিতার বই অমলাকে উৎসর্গ করেছিল এতে অমলা যেন আরও বেশি রেগে যান। অমিয়ও তার স্ত্রী অমলার এ ধরণের আচরণের কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। সুকুমারের প্রতি অমলার ঘৃণা কিংবা বন্ধু অমিয়র বিরক্তি সুকুমার যখন জানতে পারে তখন সে অপমানিত হয়ে তাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়া মনস্থ করে।

গল্পের শেষে সুকুমার অমলাকে জানায় সেও এখন থেকে অমলাকে ঘৃণা করবে। অমলা বলে এতদিন শত চেষ্টা করেও সুকুমারকে সে ঘৃণা করতে পারেনি কাজেই সুকুমারও তা পারবে না। এতদিন সুকুমারকে ঘৃণা করার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অমলার প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা। ভালোবাসার অপর পীঠ ঘৃণা। অমলাও একদিন তাই মিথ্যেই সুকুমারকে ঘৃণা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

অমলার আপাত কঠিন কঠোর ব্যবহারের আড়ালে যে সুকোমল মনটি সুকুমারের জন্য সদা সর্বদা ব্যকুল হত সে কথাই অন্তর্যামী গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখিকা আশালতা সিংহ দেখিয়েছেন।

'প্রেমে পড়া' — আশালতা সিংহের 'প্রেমে পড়া' গল্পটি 'অন্তর্যামী' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প।

এই গল্পে পাচ্ছি অলকানন্দাকে। সে বেথুন কলেজে ছাত্রী । হঠাৎ অলকানন্দ কলেজ যাওয়া ছেড়ে দিল। কলেজে পড়াটা ওর কাছে সময় নষ্ট মনে হল। কারণ কলেজে ধরা বাধা সিলেবাসে যত বই আছে তার থেকে বাড়িতে সে অনেক বেশি বই পড়তে পারে।তাই কলেজে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করতে সে চায় না। প্রথম প্রথম সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প-আড্ডা দেওয়ার একটা মোহ ছিল এখন সেসবও আর ভালো লাগে না। আশালতার ভাষায় '... ক্রমশই ও বড় বেশি সীরিয়াস হয়ে পড়চে।'[৫] অলাকানন্দা শ্রী

অরবিন্দের, এইচ.জি. ওয়েলস্ এর বই পড়ে। এযুগে এমন গম্ভীর প্রকৃতি হওয়া উচিত নয় কিন্তু অলকানন্দা নিজেই বোঝে না কেন তার এধরনের মনের গড়ন।

কোলকাতায় বসবাসের আগে সে পশ্চিমের এক শহরে থাকত। সেখানে তাদের বাড়িতে সপ্তাহে দু-তিনটি করে গানের জলসা, পার্টি এসব হত সেখানে অলকানন্দা মিষ্টি গলায় গান গেয়ে সকলের প্রশংসা পেত। আশালতার প্রায় প্রতিটি গল্পের নায়িকারাই গান গায় এবং তাদের গানকে উপলক্ষ্য করে বাড়িতে পার্টি হয়। আশালতা নিজেও মার্গসঙ্গীতের চর্চা করতেন থাকতেন পশ্চিমের শহরে অর্থাৎ বিহারের ভাগলপুরে। আশালতাদের ভাগলপুরের ঐ বাড়িতে গান-সাহিত্যের চর্চা হত।

চা খেতে অলকানন্দা ভালবাসলেও পার্টি চলাকালীন গানের আসরে চা খাওয়া মানে তার মতে চা-এর স্পিরিচ্যুয়ালিটিকে গলা টিপে হত্যা করা। তাই 'নীচের ঘরে যখন ওর গানের প্রশংসার সাথে নানা ধরণের কথাবার্তা, নানা আয়তনের হাসির সঙ্গে সঙ্গে চায়ের পেয়ালার ঠুং ঠুং শব্দের সঙ্গত পাল তুলে চলত - অর্থাৎ যখন টি পার্টিটা তার ক্লাইম্যাক্স বিন্দুতে পৌঁছাচ্ছে বলতে হবে তখন ও মনে মনে একলা থাকবার জন্য আর্ত হয়ে উঠত।'[৬] একা নিজের মনকে নিয়ে নাড়া চাড়াকরতে করতে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করাই ওর স্বভাব।

অতিরিক্ত মনোবিশ্লেষণ, আত্মবিশ্লেষণ এবং অন্যকে বিশ্লেষণ করতে করতে ওর দৃষ্টি হয়ে উঠেছে ঝকঝকে, ও নিজেকেও খুব পরিস্কারভাবে বোঝে। কোন ভালো বই না পেলে ওর পড়তেই ইচ্ছা করে না। অলকানন্দার মত প্রেমে পড়াটা মেয়েদের প্রকৃতিগত এবং বন্ধুত্ব করাটা মেয়েদের পক্ষে অস্বাভাবিক।

এই উক্ত অভিমতগুলো আশালতারও, কারণ আশালতাও তাঁর 'নারী' নামক প্রথম প্রবন্ধতে এই কথাই বলেছেন।

কলেজের বোর্ডিং এর বাস তুলে দিয়ে অলকানন্দা তাঁর নিজের শহরে ফিরে এল। পশ্চিমের এই শহরটির পাশেই গঙ্গা নদী। বাড়ীটির তেতালার একটি ঘরে একাই থাকে অলকানন্দা।

অলকার মনে হয় প্রতিটি মানুষ এককভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাস করছে। কারও সঙ্গে কারও যেন যোগ নেই। আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথও যেমন তাঁর ছিন্নপত্রে 'সোনার তরী' কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন — 'প্রতিটি মানুষই একক, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। আপনার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বসবাস করিতেছে।'

বেশি টাকা, টাকার পেছনে ছোটার ফলেও মানুষের স্বাভাবিক রসবোধ, সৌন্দর্যবোধ কমে যায়। যেমনটা হয়েছে অলকানন্দার বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেও। উপরন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ব্যস্ততাও বেড়েছে।

অলকার পরিবারের প্রতিটি মানুষ স্বার্থ-অর্থ উপাসনা কামনা নিয়ে এক একটা স্বতন্ত্র জগতের বাসিন্দা হিসাবে যেন বিরাজ করছে।

সময় কাটাতে অলকানন্দা প্রবন্ধ লেখে, একটার পরএকটা, অমল অলকানন্দার দাদা, অমল কোলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ে, অমলের বন্ধু নরেশ। নরেশ ইংরেজী, ইতিহাস, সংস্কৃত — এই তিনটিতে এম.এ পাশ করেছে। অমল-নরেশের প্রায়ই কথা বার্ত তর্কাতর্কিচলে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে অলকা ওদের চা-দিতে এসে কথাবার্তা শোনে; ইদানিং সেও প্রায় ঐ তর্কে যোগ দিতে শুরু করেছে। অলকানন্দার ধীরে ধীরে নরেশকে ভালো লাগে, দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অলকার প্রখ র বুদ্ধি; উপস্থাপনের ভঙ্গি তার ব্যক্তিত্ব তাকে সবার থেকে আলাদা করেছে।

অলকা মেয়েদের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বলে — যে মেয়েদের জীবনের ভয়ঙ্কর শূন্যতার জন্যই তারা লেখে।

অলকানন্দা বড় বড় বই পড়ে, জগতের প্রায় প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধেই যেন তার একটা স্পষ্ট মতামত রয়েছে। সে স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে তাই দাদা অমলের বন্ধু নরেশও অলকানন্দার বন্ধু। অলকানন্দার মত ইনটেলেক্চ্যুয়াল মেয়ে সচরাচর তৎকালীন যুগের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ খুব একটা দেখা যেতনা। অলকানন্দার আবেগহীন শক্ত পোক্ত ভাব যতই নরেশের ভালো না লাগুক কিন্তু অলকার থেকে দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখাও নরেশের পক্ষে সম্ভব হয় না। বন্ধুত্ব নয় অলকানন্দের সাথে প্রেমের বন্ধনেই বাধা পড়বার জন্য নরেশ উতলা হয়ে রয়েছে। অলকানন্দা এবং নরেশের এই সম্পর্কের চালকের অংশে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে অলকান্দাই। মাঝে মাঝেই নরেশ ভাবে 'এত ঝকঝকে মেয়ে নিয়ে নরেশ করবেই বা কী। কিন্তু অলকাকে এক মিনিটের জন্যও ভুলে থাকা অসম্ভব।'[৭] অলকানন্দা ভাবে —

> 'মানুষের প্রেমে পড়াটাই একটা রোগ। তার মতে মনোম্যানিয়া। আবেগের কাছে নত হয়ে যারা সর্বদা মনের মধ্যে প্রেম প্রেম ভাব নিয়ে সদা ভাবিত তাদের ঐ প্যানপ্যানে কথা অলকার অসহ্য লাগে।'[৮]

নরেশ এর আগে বন্ধু অমলের সঙ্গে গল্প করতে করতে পুরুষের অহংকার নিয়ে বলেছিল —

> '... আমাদের আমিত্ব বোধ মেয়েদের চেয়ে ঢের বড় এবং ঢের তীব্র। কিন্তু অলকানন্দাকে জেনে তার ঐ পৌরুষজনিত অহংবোধ যথেষ্টই ধাক্কা খেল।'[৯]

তবে এও ঠিক ধীরে ধীরে নরেশকেও যে অলকার ভালো লাগতে শুরু করেছে তা সে অস্বীকার করেনি আর তাই সে নরেশকে বলে —

'ঈশ্বর যে মেয়ে পুরুষকে কেবল শুষ্ক বন্ধুত্ব করতেই সৃষ্টি করেননি, করেছেন যে উদ্দেশ্যে সে উদ্দেশ্য সফল করতে তাদের মধ্যে কতো বেদনা, কত জটিলতা, কতো মাধুর্য্যের সঞ্চার করে দিয়েছেন - সে রহস্যের আমি কতটুকু জানি? '[১০]

অলোকা পরোয়া করে না — কে তাকে কি ভাবল, কে তাকে কিভাবে নেবে — এসব ভেবে মোটেই মাথা ঘামায় না। সে তার অনুভূতিও সবার সঙ্গে ভাগ করতে চায় না, সে নামের প্রত্যাশীও নয়। এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ সেকালে কেন একালেও দুর্লভ।

'অপমান' — প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না।

গল্পে দেখি দীপেশ আভাকে ভালোবাসে, দুজনের বিয়ে হবে। দীপেশ আগ্রা ঘুরতে গেছিল, সেখানে আভাকে দীপেশ চিঠি লেখে, দীপেশকে দেখতে না পেয়ে আভার বিরহী মন ব্যাকুল হয়। রবিবার কলেজও নেই তাই আভা তার বান্ধবী পুষ্পার বাড়িতে যায়। পুষ্পাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়, বৃদ্ধ পিতা একমসয় বেহালা বাজাতেন। ছবি আঁকতেন। পিতার জন্য পুষ্পকে বেহালা এবং ছবি আঁকা শিখতে হয়েছে হয়তো পিতার কাছেই, পুষ্পা সারাদিন বাড়ির কাজ করে, বৃদ্ধ পিতার সেবা যত্ন করে উপরন্তু সে একটি স্কুলে পড়ায় দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত চাকুরীতেই নিযুক্ত থাকতে হয়। কাজেই সমস্ত দিক সামলে তার আর শিল্পচর্চা হয় না। এত কিছুর মধ্যেও তার মধ্যে সরল মনটুকুআছে তা বোঝা যায় যখন সে তাদের বাগানের জুই ফুল তুলে আভাকে দিয়ে বলে — ''এইগুলো নিয়ে যা। দীপেশের চিঠির জবাব লেখার সময় টেবিলের উপর একটু জল দিয়ে সাজিয়ে রাখিস।''[১১]

দীপেশ-আভা পরস্পরের প্রতি যখন অনুরক্ত তখন তাদের পরিবারে আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্টই তাই ঐ দিকটা নিয়ে কাউকেই ভাবতে হয়নি।

দীপেশকে আভা জোর করে পুষ্পাদের বাড়ি নিয়ে যায়। পুষ্পা আভার চেয়ে দেখতে সুন্দর হলেও সংসারের জাতাকলে পিষ্ট পুষ্পাকে হঠাৎ দেখে দীপেশের ভালো লাগেনি, ভালো লাগেনি তার হাতের বাজনা শুনতে, পুষ্পার বাবা হরকান্ত বাবুর পুষ্পার বাজনা শোনানোর জন্য নাছোড় অবস্থা — সাংসারিক বাস্তবতার এই দিক গুলো দীপেশ উপেক্ষা করতে পারলেই যেন বাঁচে। উপরন্তু দীপেশ আড়ালে পুষ্পাকে মাস্টারনী বলে। দীপেশ প্রশ্ন করে —

'আর ওই সব মাস্টারনী জাতীয় জীবের সঙ্গে তোমারই বা এত বন্ধুত্ব কেন আভা? ওদের আছে কী? ওই তো শুকনো কাঠখোট্টা চেহারা। জীবনে ওরা

পেলে কী? দেহ এবং মনকে শুষ্কতার চরম সীমানায় নিয়ে যেয়ে ওরা অবশেষে যখন যৌবনের প্রান্তে পা দেবে তখন হয়ে উঠবে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত পরছিদ্রান্বেষী নিষ্ঠুর।''[১২]

আভা কিন্তু দীপেশের এসব কথায় সায় দিতে পারে না, সে বলে —

'... য়ুরোপের কত মেয়েই ত সারা জীবন অবিবাহিত থেকে কত বড় বড় কাজ করেন।'[১৩]

এসব শুনেও দীপেশ আভাকে দোহাই দিয়ে বলে যে, সে যেন ফেমিনিষ্ট না হয়। ''আর যাই হও আভা ফেমিনিষ্ট হতে যেও না। দোহাই তোমার।''[১৪]

পিতার আদেশে পুষ্পা আভাদের বাড়িতে আসতে বাধ্য হয়, ঘরের ভেতরে ঢোকার অগে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দীপেশ আভার কথাবার্তা পুষ্পার কানে যায়। ফিরে গেলে পিতার তিরস্কারের কথা ভেবে পুষ্পা আভার ঘরে যায়। পুষ্পকে দেখে আভা চমেক উঠলেও দীপেশ ভারী আমোদ ক'রে তাকে ঠাট্টা করে, অপমাণিত পুষ্পার বিদায় হলেও তার সম্বন্ধে দীপেশ বলে ওঠে 'What a funny creature'?

মহাধুমধামের সাথে দীপেশের আভার সঙ্গে বিয়ে হয়, বিয়ের পর দীপেশ ঠিক করে আভাকে নিয়ে কোলকাতায় যাবে। কোলকাতায় গিয়ে দীপেশ আভাকে জানায় যে প্রচুর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে আড্ডা দেবে আর আভা অবসর মতো এদিক ওদিক ঘুরবে, তারা দুজনেই স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে জীবনকে উপভোগ করবে এতে আভার তেমন সায় না থাকলেও দীপেশের সঙ্গে তার পেরে ওঠা সম্ভব নয় বুঝে অগত্যা দীপেশের ঠিক করা মতে তাদের জীবন চলে।

কিছুদিন এভাবে চলোর পর 'পরস্পরের পাট গেছে বদলিয়ে।'[১৫] এখন আভা প্রায়ই বাড়ি থাকে না কিন্তু দীপেশ ঘরের কোণে চুপচাপ বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে। আজকাল বেশি হৈচৈ তার আর ভালো লাগছে না।

এদিকে পুষ্পার বিয়ে হয়ে যায় একান্নবর্তী এক পরিবারে। দেওর অপূর্বর সঙ্গে দীপেশ একদিন ঘুরতে ঘুরতে পুষ্পার শ্বশুরবাড়িতে আসে। ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত দীপেশকে অত্যন্ত যত্ন করে আহার করানোর মধ্য দিয়ে দীপেশের উপর তার লাঞ্ছনার শোধ নেয় পুষ্পা। সর্বোপরি দীপেশ অনুভব করে যে সুন্দরী-সর্বগুণের অধিকারী সংযত, সেবাপরায়ণ পুষ্পা নামের মেয়েটি পুরুষের সুখ-শান্তির বিধান কত সুচারুরূপে করছে, তুলনায় আভা কত ম্লান।

গল্পটিতে পুষ্পা এবং আভা দুজনেই যথেষ্ট সংবেদনশীল, তাদের মধ্যে মানবিকতা বিবেক রয়েছে;

তুলনায় দীপেশ খুবই অসংযমী, অমানবিক, তাই পুষ্পার দুরবস্থা দেখে সে যেমন তাকে অপদস্ত করেছিল আবার বিয়ের পর আভাকে তার নিজের নিয়মে চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এমনকি নিজের স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও সে গুরুত্ব দিতে জানে না।

'পরিবর্তন' — গল্পটির প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না গ্রামের মেয়ে কমলার চোদ্দ-পনের বছর বয়স বিয়ে হয় শহরের নামজাদা উকীল হরনাথ বসুর বাড়িতে তার পুত্র সুবেশ বসুর সাথে। কমলা পড়ালেখায় অমনোযোগী কিন্তু গাছে চড়তে, নদীতে-পুকুরে সাতার দিতে ওস্তাদ, তার জুড়ি কেবল গ্রামের কালীতারা। কমলার বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল হলেও কালীতারা গরীব গৃহস্থের মেয়ে।

শহরের ধনীগৃহে কমলার বিয়ে হলে শহরের আধুনিক সাজসজ্জায় অনভ্যস্ত কমলা প্রায়ই ননদদের হাসির খোরাক হয়। চিরদিনই কমলা স্বাধীনভাবে গ্রাম্য প্রকৃতির কোলে বাবা-মা-দাদাদের অদরে মানুষ, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার অজ্ঞতা নিয়ে হাসাহাসি করে, এ কমলা কিছুতেই হতে দেবে না। তার ভেতরের শক্তিময়ী ব্যক্তিত্বপ্রবণ নারী মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে '' ... হৌক ইহাদের বাড়ীর সমস্ত অজানা, সমস্ত অভিন্ন, তবুও আমি প্রাণপণ বলে সমস্তই অয়ত্ত করিয়া লইব। আমাকে দেখিয়া কেহ যেন অনুকম্পা এবং অবজ্ঞায় হাসিতে না পারে।''[১৬]

কমলা নিজের চেষ্টায় সভ্য সমাজের সভাস্থলে যাওয়ার উপযোগী করে নিজেকে তৈরী করে নিলেও একটি সন্তান জন্মানোর পর থেকেই তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে।

কমলাও আজকাল তার শরীর নিয়ে বিব্রত থাকে, সারাদিনই মেপে মেপে ওষুধ খাওয়া, শুয়ে থাকা খুকীকেও নিতে পারে না। খুকী সারাক্ষণ আয়ার কোলে কোলে ঘোরে।

কমলার এমন অবস্থায় তার দেওর রমেশ পরামর্শ দেয় বৌদিকে যেন তার বাবার বাড়ি গ্রামে কিছুদিন রেখে আসা হয়। সুরেশ স্ত্রীকে তার বাবার বাড়িতে কিছুদিনের জন্য রেখে আসে। সঙ্গে খুকী এবং আয়াও যায়।

গ্রামে বাপের বাড়িতে গিয়ে কমলা তার হারিয়ে যাওয়া কৈশোরের দিনগুলি যেন ফিরে পায়, তবে এখন সে যেন বড় বেশি সন্ত্রস্থ থাকে। আগের মতো সে যেন দামালপনা করতে পারে না। গ্রামে গিয়ে কালীতারার সঙ্গে কমলার দেখা হয়। কালীতারার স্বামী গ্রামেরই ডাক্তার; টমটমে করে দূরে দূরে রোগী দেখতেও যায়, ফিরতে দেরি হলেও পতিব্রতা কালীতারা স্বামীর আগে খায় না। সন্তান দুটিকে

কালীতারা স্নেহের আঁচলে আগলে রেখেছে, সমস্ত সংসারের কাজ কর্ম সে একাই করে, নিজের দিকে নজর দেবার তার ফুরসৎ হয় না।

গ্রামে সখী কালীতারাকে দেখে কমলার যেন ঘুম ভাঙ্গে। শহরে ফিরে এসে কমলাও কালীতারার অনুসরণে খুকির দেখভাল করা স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সকল লোকের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে প্রাণপাত পরিশ্রম করে এবং এসব সে যথেষ্ট আনন্দের সঙ্গে কর্তব্য মনে করেই করে।

পল্লীগ্রামের কালীতারাই আদর্শ নারী। শহরে গিয়ে আধুনিক হয়েও অবশেষে কমলা পল্লীগ্রামের সেকেলে কালীতারাকে অনুসরণ করে। এটাই সমাজ চায়। কিন্তু লেখিকা কী বলতে চাইছেন? লেখিকার সত্যিকার স্বরটা কী আমরা ধরতে পারছি?

'রমা' — উত্তরা পত্রিকায় ১৩৪১এর আষাঢ় সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।

রমা নামের একটি মেয়েকে ঘিরেই গল্প। রমার বিয়ে হয়ে গেছে। গ্রামোফোনের রেকর্ডে বেজে ওঠা একটি গানের কলি —

''আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিলরে
পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থর থর কম্পন...''[১৭]

— শুনে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যায় রমার।

রমার মনে পড়ে তার কৈশোরকালের কথা, সে তখন ছিল অত্যন্ত বোকা এবং লাজুক। রঙ ফরসা এবং চেহারা মন্দ না হলেও '... নিজেকে কিছুতেই প্রকাশ করতে না পারার যে বোবা প্রকাশহীন কুশ্রীতা, সেই বস্তুরই একান্ত বাড়াবাড়ি তার চেহারায় তার আচরণে সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান।'[১৮] অথচ রমার মায়ের বিশেষ ইচ্ছা রমা আজকালকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সদা শঙ্কিত রমা ম্যাট্রিক স্কুলের সেকেন্ড ক্লাসে উঠল। ইতিমধ্যে রমাদের বাড়িতে আবির্ভাব হল তাদের এক দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয় বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের সুদর্শন চেহারার ছেলে খদ্যোতের। খাদ্যোত অভাবের তাড়নায় ভাঙ্গা স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় পশ্চিমের একট স্বাস্থ্যকর শহরে যেখানে রমারা থাকতেন সেখানে এলেন। রমার বাবাকে খদ্যোত কাকা বলে ডাকে। রমার মাও খদ্যোত-এর মত প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী ছেলেকে পেয়ে খুশিই হলেন। মেয়ে রমাকে তার মা খদ্যোতের তত্ত্বাবধানে একটু ঝকঝকে করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও খদ্যোত রাজি হয় কারণ কাকিমাকে খদ্যোত চটাতে চায় না।

যাই হোক রমাকে তার মা দুটো সাজা পান দিয়ে খদ্যোতের কাছে পাঠিয়ে দেয়। খদ্যোত রমাকে বলে যে, রমাকে সে গান শেখাবে। খদ্যোত শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত —

'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
এ পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে...''[১৯]

খদ্যোতের একান্ত প্রচেষ্টায় রমা অনেকটাই ঘষে মেজে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। রমার নির্বুদ্ধিতায় খদ্যোত প্রথমে বিরক্ত হলেও ধীরে ধীরে রমার নির্ব্বুদ্ধিতার ঘন আবরণ ভেদ করে তার মধ্যে একটি শান্ত কমনীয় ভাব ফুঠে ওঠে যা খদ্যোতের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়েও রমাকে কিছুটা পরামর্শ দেবার প্রচেষ্টাচালায় খদ্যোত।

এরপর খদ্যোতের তত্ত্বাবধানে রমা কিছুটা ছবি আঁকাও শেখে। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বড় মেয়ে মমতা আধুনিক ঝকঝকে মেয়ে নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে যেমন সচেতন নিজেকে প্রকাশ করার ভঙ্গি ও তার করায়ত্ত। আশালতার বেশিরভাগ নায়িকাদের মতোই মমতা অশালতার নিজের আদলেই গড়া কিন্তু রমাকে আশালতা সৃষ্টি করেছেন নিজের বোন প্রীতিলতার আদলেই — এ মন্তব্য স্বয়ং প্রীতিলতার কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ মহাশয়ের।[২০]

আশালতা বরাবরই আত্মসচেতন, বহু দেশী-বিদেশী গ্রন্থ পড়া বুদ্ধিমতী মেয়ে, আত্মপ্রকাশে উদ্‌গ্রীব আশালতা চেয়েছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পন্ন আধুনিক রুচির মানুষ - পরিবারে নিজেকে মেলে ধরতে। আশালতার জীবনে এ সমস্ত আকাঙক্ষা অনেকটা অবদমিত হয়েছিল তার সেকেলে প্রাচীনপন্থী পাড়াগায়ে শ্বশুরবাড়ির জন্য। অথচ নির্বোধ কম বুদ্ধি প্রীতিলতা নিজেকে প্রকাশ করতে সর্বদাই সঙ্কুচিত। জীবনে যার খুব বেশি চাওয়া পাওয়াও ছিল না তার ভাগ্যের চক্রে বিয়ে হয় আধুনিক সংস্কৃতি মনস্ক খোলামেলা শহুরে পরিবারে।

প্রীতিলতা যা চায়নি তা অনায়াসেই তার ঝুলিতে ভগবান দিয়ে দেয় অথচ আশালতা সারা জীবন চেয়েও তা পায় না ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই ক্ষোভ পরোক্ষে আশালতার লেখা কিছু গল্পে ধরা পড়েছে। যেমন 'তরুণ প্রতিবেশী' গল্পটিতেও বিমলা-কমলা নামে দু-বোনের দেখা পাই। যেখানে বিমলা আত্মসচেতন, বুদ্ধিমতী, আধুনিক সংস্কৃতি মনস্কা তুলনায় বোন কমলা অনেকটাই ভোতা। কিন্তু বিমলার বিয়ে হয় পেশায় উকিল একটু বয়স্ক হরলালের সঙ্গে আর কমলার বিয়ে হয় সাহিত্যবোধ সম্পন্ন সুশ্রী পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক রমেশের সঙ্গে যে রমেশকে দেখে দিদি বিমলারও তার বোনের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা হয়।

'সমর্পণ' — গল্পটি উত্তরা পত্রিকায় ১৩৩৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সতীশের জীবনে কীভাবে নলিনীর প্রতিষ্ঠা হল তাই গল্পটিতে বলা হয়েছে। সতীশ শিল্পী, সে এস্রাজ বাজায়, গান করে, নলিনী ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা, সতীশের বন্ধু মহেন্দ্র নানা কাজের চাপেই সর্বদা ব্যস্ত, সেই মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্য সতীশের কাছে আসে, কিছু দিনের জন্য সে এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে।

এখানে এক সাহিত্য সভায় তার পরিচয় হল নলিনীর সাথে। নলিনীর প্রতি এখানকার সকলেরই একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে। লেখিকা জানাচ্ছেন নলিনীর আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্য্যের মাঝে একটি প্রশান্তি ছিল। একদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও আশালতার লেখা নারী প্রবন্ধ পাঠ করে তার মধ্যে 'আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের প্রশান্তি' দেখেছিলেন।

নলিনী স্বভাব-চরিত্র অধ্যাপনা মতাদর্শ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে নলিনীকে আশালতা নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপনা করার আগে থেকেই নলিনীর সঙ্গে সতীশের পরিচয় ছিল নলিনী দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে কার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে সতীশের এক সময় মনে হয়েছিল সে নলিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু নলিনী নিজের হৃদয়ের সাড়া তখনও তাই বাড়িতে নলিনীকে বিয়ের জন্য তাড়া দিলেও সে তখন রাজি হয়নি। বিয়ে করতে রাজি না হয়ে সে চাকুরী নিয়ে যেখানে চলে যায় সেখানে সতীশও চলে যায় কারণ নলিনীকে না দেখে সতীশ কিছুতেই থাকতে পার না। নলিনীর প্রতি সতীশের ভালোবাসার মধ্যে যদিও সম্ভ্রম এবং সংযমের অভাব ছিল না।

একসময় সতীশ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সতীশের ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভের সময় তার শ্রান্ত অবসন্ন মুখখানি দেখে নলিনীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী তেজস্বী মেয়ের মনও টলে যায় এবং গোধূলিবেলায় নলিনী উপলব্ধি করেন যে সেও সতীশকে ভালোবাসে; সতীশকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষেও সম্ভব নয়।

'আবির্ভাব' — গল্পটি উত্তরা পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সতীশের জীবনে কীভাবে লীলার আবির্ভাব ঘটে সেকথা বন্ধু কুমুদকে সতীশ নতুন করে বলার মধ্যে দিয়েই গল্পটি এগিয়ে গেছে। সতীশের বাড়িতে প্রায়ই কুমুদ আসে। সতীশ, কুমুদ, লীলা তিনজনে মিলে সান্ধ্য বৈঠক বসায় সতীশের ঘরে। সেই সান্ধ্য বৈঠকে বর্ষাস্নাত দিনে সতীশের মনে পড়ে কিভাবে তার জীবনের সাথে লীলার উদয় হয়েছিল।

বাংলাদেশে বিবাহযোগ্য কন্যার কোন অভাব যেমন ছিল না তেমন আজ থেকে একশো বছর

আগে মেয়েদের অবির্ভাব-জন্মানো তথা বিবাহকালের কোনরকম মর্যাদা-সম্মান দেখানো হত না। এতটাই অকিঞ্চিৎকর ছিল তাদের জীবন। সেই সমাজ কাল পরিপ্রেক্ষিতে সতীশের জীবনে লীলার আবির্ভাবের ঘটনাও যে ফলাও করে বলার বিষয় হতে পরে এ কল্পনা করতেও বেশ অবাক লাগে। এখানেই লেখিকা আশালতার অভিনবত্ব।

'আশঙ্কা' — গল্পটি বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৯ এর মাঘ মাসে প্রকাশিত হত।

গল্পে দেখি অমল এবং সুনীল দুই বন্ধু পাটনা কলেজে পড়ে, সেখানকার মেসেই থাকে। কোলকাতায় অমলের মামা বাড়ি এবং সুনীলের মাসির বাড়ি। কলেজের পড়া শেষে দুজনেই কোলকাতায় ঘুরতে এসেছে।

সুনীলের মাসীমার দুই ছেলে মেয়ে সুধীর এবং সুচরিতা। সুনীলের সঙ্গে অমলও এসেছে সুনীলের মাসির বাড়িতে। সেখানে সকলের সঙ্গেই তাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পর অমল নিজ গুণেই সকলের কাছে সমাদর পায়। বিশেষ করে অমলের বেশভূষা-কথাবার্তা-ব্যক্তিত্ব তাকে সকলের থেকে আলাদা করে চোখে পড়ে।

সুচরিতার সঙ্গে প্রথম আলাপেই অমল যথেষ্ট আন্তরিকভাবে তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা জুড়ে দেয় যেমন — মেয়েদের মনের আবেগকে প্রশমিত রাখতে তাদের সায়েন্স পড়া বিশেষত অঙ্কে অনার্স পড়া উচিত। অমল বলে —

> 'রাশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে মেয়েদের কোন প্রকার কাজের জন্যই কেউ অনুপযুক্ত মনে করে না এবং তারা সকল রকম কাজের দায়িত্ব সর্বাঙ্গীণ ভাবে বহন করচে। তাদের মন স্বাধীন অথচ দেহ পরাধীন এমন অর্দ্ধেক স্বাধীনতার ভূত সেখানে কোথাও পাবে না।''[২১]

অমলের মুখের একথা যে প্রকৃত পক্ষে আশালতারই মনের কথা একথা বুঝতে সচেতন পাঠকের অসুবিধা হয় না।

শুধু এটাই নয় অমল বলে যে মেয়েদের চেহারা ভালো রাখা সুন্দর রূপে গড়ে তোলা যেমন দরকার ছেলেদেরও তেমনই সৌন্দর্যটা আবশ্যক। যদিও 'পুরুষ মানুষের টয়লেট ব্যবহার করা এদেশে হাস্যকর'[২২] । কিন্তু বিলেতে এমন নয়। বলা বাহুল্য অমলের বলা এ মত স্বয়ং তার স্রষ্টা আশালতারও।

এমন প্রগতিশীল, কথাবার্তা, দেহগত সৌন্দর্য সমেত ঝকঝকে অমলকে সুচরিতার ভালো লাগল। তাই সুচরিতা রাশিয়ার সম্বন্ধে যে সব বই আছে তা যেমন পড়তে লাগল তেমনি তার হাতের লেখা, মানসিকতায় অনেকটা অমলের প্রভাব পড়ে। অমলও সুচরিতার মত ব্যক্তীত্বময়ী, সুন্দরী মেয়েকে ভালোবাসল। এই ভালেলালাগা-ভালোবাসা কীভাবে দুজনের মাঝে স্বীকৃতি পায় সেইদিকেই গল্প ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ভালো রেজাল্ট করে অমল বিলেত যাচ্ছে, বিলেত যাবার আগে সুচরিতাকে অমল ভুলে যাবে কিনা সে প্রশ্ন সুচরিতা করলে অমল বলে যে — তোমার মধ্যে সেদিন আমি এক মুহূর্তের মধ্যে যা দেখেছি, সে কি সব আমার জন্যে? তা কি হতে পারে? সে আমার চেয়ে ঢের বড়। সে আমার মনে রাখা না রাখাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেছে। তোমার মধ্যে যা আছে, তাকে তুমি জাগাবে না কি? আমি হয়ত কেবল তার উপলক্ষ্য মাত্র।''[২৩]

অমলের এই উক্তিই লেখিকা আশালতারও মনের কথা। প্রেম, ভালোবাসা একজনের জন্য নিজেকে সমর্পণ, অপেক্ষা করা ছাড়াও মেয়েদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা এসব কিছুর উর্দ্ধে। জগৎ জীবনের প্রতি মেয়েদেরও অনেক কর্ত্তব্য-কর্ম রয়েছে যা ক্ষুদ্র প্রেমকেও ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যাবে।

'দেশের কাজ'— গল্পটি উত্তরা পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মেয়ে মণিকা দে সংসারের জোয়াল টানতে মাত্র আঠারো বছর বয়স থেকেই স্কুলের চাকুরী নিয়ে বিহারের একটি শহরে একা থাকে। এরপর যে প্রাইভেটে বি.এ., বিটি পাশ করে। এক্ষেত্রে তাকে উৎসাহ দিয়েছিল বছর পঁয়তাল্লিশের শ্যামাচরণবাবু যিনি আবার তিনমাসের জন্য কারাবরণ করেছিলেন এবং স্কুলে যাবে এবং চরকা কাটায় ছেলেমেয়েদের বিশেষ উৎসাহ দেন।

অন্ধ মোহে মণিকা শ্যামাচরণকে দেবতার আসনে বসালেও মণিকার ছাত্রী কমলা কিন্তু শ্যামাচরণের আসল উদ্দেশ্য টের পায়। মণিকাকেকমলা সাবধান করতে চেয়েছিল কিন্তু মণিকার অবস্থা ছিল তখন চাতক পাখির মত তাই মণিকার মোহ ভাঙ্গাতে কমলার কেমন যেন মায়া হয়।

কমলাকে মণিকা তার বাড়িতে বিকালে পড়াবার জন্য ডেকে নিয়েছিল। শ্যামাচরণবাবুও ঐ সময় মণিকার ওখানে আসতেন কিন্তু তার আসল কারণ ছিল হত দরিদ্র কালো রোগা উস্কু খুষ্ক চুলের মণিকাকে দেখা বা তার সঙ্গে আলাপ করা নয়, কমলার মতো সুন্দরী, অল্প বয়সী মেয়েকে দর্শন করা; তার রূপ বসে বসে আকণ্ঠ পান করা।

একদা মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শ্যামাচরণ বলেন যে —

''মণি তোমারা যে আমাদের কথা মত এবং আমাদের পছন্দ মত নিজেদের গড়বে তার চেয়ে বেশি কোন অপমান নিজেদের জন্যে কল্পনা করতে পার কি? মেয়েরা দীর্ঘ কেশ রেখেচে কেন? সে দীর্ঘ কেশ নিয়ে প্রতিদিন এতখানি সময় ব্যয় করে তাকে নানা ছাঁদে সাজায় কেন?'' [২৪]

শ্যামাচরণের এমন কথায় ভন্ডামিতে কমলা জ্বলে যায়। কমলার মনে হয় মেয়েরা চুল বড় রাখবে কি ছোট সেটা মেয়েরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঠিক করবে। এ প্রসঙ্গে কমলার এও মনে পড়ে —

'... য়ুরোপের মেয়েরাও যে পর্যন্ত না ভোট পেয়েছিলো এবং নিজেরা উপার্জ্জন করতে পারার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিল ততদিন যার খায়, যার পরে তার রুচিকে উপেক্ষা করে দীর্ঘকেশ কর্ত্তন করতে পারেনি।[২৫]

কমলার ভাবনার এসব কথা যে তার স্রষ্টা অশালতারই কথা সেকথা তো অনায়াসেই বোঝা যায়।

শ্যামাচরণের ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে কিন্তু মণিকা একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভিন দেশে চাকুরীর জন্য পড়ে আছে। এদিকে কমলার বিয়ের তোরজোড় শুরু হওয়ায় সে বেশ কিছুদিন মণিকার বাড়িতেও আসতে পারছে না। মণিকার বাড়িতে সন্ধ্যায় রাত্রে শ্যামাচরণবাবু এসে বোকা, একা মণিকার নিঃসঙ্গতার, তার প্রতি মণিকার ভালোবাসা শ্রদ্ধার ফায়দা নেয়। কড়া মেজাজের স্কুলের সেক্রেটারী সহ আর পাঁচজন সমাজের লোক চর্চা করবার মত এমন জিনিস হাতের কাছে পেয়ে চুপ করে রইল না। মণিকার চাকুরীতে টান পড়ল।

মণিকার এ অবস্থা কমলা যখন জানতে পারল তখনই সে তার পিতাকে ব'লে কটকে যেখানে মণিকার পিতা মাতাও থাকেন সেখানে একটি স্কুলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিল। তাই শেষ অবধি মণিকা আসন্ন দুর্গতি থেকে খানিকটা রেহাই পেল।

'নতুন রেশ' — পুষ্পপাত্র পত্রিকায় ১৩৪০ এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পটির শুরুতেই দেখি বেলা এবং তাঁর মা লীলা দুজনে ভাঁড়ার গোছাচ্ছিল। বেলা বি.এস.সি.পড়ছে, মফঃস্বলের কলেজের সে একমাত্র ছাত্রী হলেও সে যেমন প্রচুর বাইরের বই পড়ে তেমনি মায়েরওসে বাধ্য মেয়ে। বেলার বন্ধু সুলতা বেলাকে চিঠি দিয়ে বিশেষ করে কোলকাতায় যাবার জন্য অনুরোধ করে। আগে বেলারা কোলকাতায় থাকত।

সুলতার বিয়ে হয় ড. বোসের সঙ্গে। চাকরি সূত্রে স্বামী যখন এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যেতেন বেলাও তখন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। বিয়ের চার বছর পর সুলতা আবার অন্য এক যুবকের প্রেমে পড়ে। সুলতার চিঠি পড়তে পড়তে বেলার মনে হয় —

> 'লোকে মুখে গদ্‌গদ্‌ হয়ে বাড়াবাড়ি করে বলে মেয়েরাই আসলে ধার্ম্মিক জ্ঞানের পুণ্যের জোরেই ধম্ম টিকে আছে — তার হোয়াইট হেডের মুখের সেই কথাটা মনে পড়ল। "Religion is what a man does with his solitariness" এতবড় অগ্নিপরীক্ষায় যদি পাসমার্ক পেশ করতে হয় তবে কোন মেয়ে ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রেখেচে?''[২৬]

যাই হোক সুলতার নতুন অনুরাগের বিষয়ে জানতে পয় শীতের কোলকাতাকে উপভোগ করবার জন্যই বেলা দিন কয়েককের জন্য মায়ের কথা মত তিন বছরে বড় দাদা সুধীরকে নিয়ে কোলকাতায় এল।

স্টেশনে সুলতাকে দেখে বেলার মনে হয় নব অনুরাগের ছোঁয়ায় সুলতার চেহারায় লাবণ্য দেখা দিয়েছে।

বিয়ের পর সুলতা যে ছেলেটির সঙ্গে প্রেম করছে তার নাম সুকুমার। সুকুমারকে দেখে, সুকুমার-সুলতার প্রেমালাপ শুনে বেলার একবারও তা কুশ্রী লাগছে না। বরং একটা মধুর অনুভূতিতে বেলার মনটা ভরে যায়। সুলতা সুকুমারের কোমলতাপূর্ণ প্রেম পর্ব দেখে এসে বেলা দাদা সুধীরের সঙ্গে দাবা খেলতে বসে। এত কোমলতার আবেশ বেলার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না।

এরপর সুকুমারের বাড়িতে গিয়ে সুকুমারের মায়ের স্নেহ মিশ্রিত আপ্যায়ন, তার শুচিশুভ্র নিরীহ মানসিকতা উপরন্তু সুকুমারের বসবার ঘর, লাইব্রেরীর গোছানো পরিপাটী সৌন্দর্য সর্বোপরি তার শোবার ঘরের সাদাসিধে পালঙ্কের উপর শুভ্র সৌন্দর্য বেলাকে মুগ্ধ করে।

বেলা এসব দেখে শুনে নিজের ঘরে ফিরে এসে জানতে পারে তার মা লীলদেবীর বেশ জ্বর, তিনি অসুস্থ কাজেই লীলা এবং সুধীরকে ফিরতে হবে। ফোনে বেলা সুলতার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় গ্রহণ করে। ট্রেনে করে কোলকাতা থেকে ফেরার সময় বেলার বারে বারে সুকুমারের

> '... অতুল সুন্দর বিশ্রব্ধ ঘুমের দৃশ্য বারবার আক্রমণ করে তার বুদ্ধি দীপ্ত জগতের প্রখর সাদা আলোয় আর একটা নতুন রেশ এনে ফেললে।' [২৭]

এবার কিন্তু বেলার কঠিন অঙ্ক কিংবা দাবার কঠিন চাল দিয়ে বুদ্ধির চর্চা কথা মনে এল না।

আজ থেকে একশোবছর আগে বেশিরভাগ মেয়েরা যখন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সে সময় এ গল্পের নায়িকা বেলা সায়েন্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছ অর্থাৎ বি.এস.সি পড়ছে, শুধু তাই নয় সে দা বা খেলায় তার দাদাকে কঠিন চাল দিয়ে পর্যদুস্ত করে কঠিনতম অঙ্ক কষে সে মানসিকভাবে তৃপ্তি বোধ করে। এ ধরণের মেয়ে কিন্তু তৎকালীন সমাজ পরিবেশে যথেষ্টই দুর্লভ ছিল।

বহুদিন থেকে সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে-নাটকে দয়িতারাই পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দয়িতের জন্য অপেক্ষা করছে, তপস্যা করছে; সুমুকারের ঘর- তার শয্যা, পালঙ্ক দেখে উল্টোটাই বেলা সহ পাঠকের মনে হয়, যেন সুকুমার অধীর আগ্রহে পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে তার বহু কাঙ্খিত প্রেয়সীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

'তরুণ প্রতিবেশী' — সাপ্তাহিক ছোটগল্পে ২ বর্ষ ১১ সংখ্যায় ১৩৪০ এর ১০ই ভাদ্র আশালতা সিংহের 'তরুণ প্রতিবেশী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পটিতে আমরা দেখি বিমলা এবং কমলা নামের দুই বোনকে। বিমলা বাড়ির বড় মেয়ে, তার অসাধারণ বুদ্ধি, সামায়িক পত্র এবং মাসিক পত্রে সে মঝে মাঝেই তার লেখা দেয়। বাপের বাড়ির সহরের উকিল হরকান্তবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। হরকান্ত বাবু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, স্ত্রীর ওপর তার অগাধ আস্থা এবং ভালোবাসা। মা দুর্গামনির অসুস্থতার জন্য বিমলা মা এবং ভাইবোনকে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদলের জন্য যাওয়া স্থির করে।

বহু জায়গায় ঘুরলেও দুমকার আবহাওয়ায় দুর্গমণি ধীরে ধীরে সেরে উঠছিল; যে বাড়িটি তারা ভাড়া নিয়েছিল সেটি রঙচঙে খোলামেলাই ছিল কিন্তু একদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে বোঝা গেল বাড়িটির অধিকাংশ দরজা জানালার ছিট্‌কিনি ভাঙ্গা পাঁচটি ঘরের মধ্যে তিনটি ঘরের ছাদই ফুটো, বৃষ্টির জল টপ্‌টপ্‌ করে পড়ে। তাদের এই বাড়ির সামনেই সুন্দর সুদৃশ্য একটি দোতালা বাড়ি সেখানে থাকে পোলট্রি ফার্ম্মের ম্যানেজার এবং সবজীবাগনের ডাইরেক্টর রেমশবাবু। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। এমন তরুণ প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে সকলেরই খুব ভালো লাগে; রমেশ আবার বিমলাদেবীর লেখার বিশেষ ভক্ত।

ভাইবোন এবং অসুস্থ মাকে নিয়ে এমন জরাজীর্ণ বাড়িতে উঠে বিমলা যখন নাজেহাল হচ্ছে এমন সময় তরুণ প্রতিবেশী রমেশ খুব আন্তরিকভাবে তার নিজের বাড়িখানি তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে ঐ জরাজীর্ণ বাড়িতে উঠে আসতে বিশষে আগ্রহ দেখায়। তার আগ্রহে আন্তরিকতায় বিমলারা বাড়ি বিনিময় করে।

বিমলার প্রতি রমেশের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোলাগা, মুগ্ধতায় বিমলা মাঝে মাঝে কুণ্ঠাবোধ করলেও বাড়ির সকলে কিন্তু রমেশের উদারতায় খুবই কৃতজ্ঞ। বিশেষত বিমলার পনেরো বছরের বোন কমলার রমেশের প্রতি যেন বিশেষ আগ্রহ, উৎসাহ এবং মমত্ব।

বিমলা অধিক রাত জেগে লোখলেখির কাজ করে বলে রমেশ তাকে অনুযোগ করে, বিশেষ করে বিমলার এতে শরীর এবং চোখ খরাপ হতে পারে বলে সে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে। রমেশের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় বিমলা নিজের দুর্বলতা কাটাতে স্বামী হরকান্তকে চিঠি লেখে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। চিঠি লিখে বিমলা অবশ্য বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে মনের সমস্ত আবিলতা ঝেড়ে ফেলে চিঠিটা আপাতত সে তার বাক্সেই রাখে, ডাকে দেয় না।

কিছুদিনের মধ্যে দুর্গামণিদেবী আবার হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাদের ফেরার পথ দেখতে হয়। কিন্তু রমেশের মতো সুপাত্রকে কমলার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে বেশ হয় সেই জন্য দুর্গামণিদেবী মেয়ে বিমলাকে বলেন — 'তুই একটিবার বলে দেখ না বিমলা। শুনেচি দিদি বলতে ও অজ্ঞান হয়।'[২৮] (পৃ.৩৫৭)

কথাটা শুনে বিমলার খারাপ লাগলেও কিছুদিন দিন পরে অবশ্য বিমলাই প্রস্তাবটা রমেশকে জানায়। বলা বাহুল্য রমেশ রাজি হয়ে যায়।

বিয়ের পরেও রমেশ বিমলার প্রতি তাঁর মুগ্ধতা কমাতে পারে না। বিমলা ন বছর বয়সে 'চরিত্রহীন' এবং এগার বছ র বয়সে 'ঘরে বাইরে' পড়েছে - এসবই কম লার মুখ থেকে শোনা। কমলা তার পনেরো বছর বয়সে কি কি উপন্যাস পড়েছে জানতে চাইলে সে অবশ্য বলে '...নভেল পড়তে আমি অতো ভালোবাসিনে। তাছাড়া ভালো করে বুঝতে পারিনে।'[২৯]

রমেশ উপলব্ধি করে কমলা তার দিদি বিমলার মতো জিনিয়াস নয়। এতসব যার সম্বন্ধে ভাবা সেই বিমলা কিন্তু শুধু আফসোস করে ভাবে '... সে যদি জিনয়াস এবং দেবী না হয়ে শুধু আর দুবছর পরে জন্মাত।'[৩০]

'সুখবাদ' — ১৩৪০ এর কার্ত্তিক সংখ্যায় উত্তরা পত্রিকায় গল্পটি বের হয়।

'সুখবাদ' গল্পে আমরা দীপ্তিকে দেখি অসাধারণ সুন্দরী, তার নিজের চেহারার সৌন্দর্য দেখে সে নিজেই মুগ্ধ তাই দেখি '...দীপ্তি তার চুলের গোছা হাতে জড়িয়ে আয়নায় আপনার ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল (পৃ. ৩৬০)।'[৩১] সুন্দরী এবং তন্বী দৃপ্তির বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। সে একটি দুধসাদা রঙের রেশমের শাড়ি পরে বান্ধবী মানসীদের বাড়িতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। মানসীদের বাড়িতে বিখ্যাত

কবি রমা দত্তর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য একটি সম্মিলনী বসেছে।

মানসীদের বাড়িতে কথা প্রসঙ্গে খদ্দরের কথা উঠলে দীপ্তি বলে — মেয়েদের কখনোই খদ্দর পরা উচিত নয় কারণ ও কাপড় এত বিশ্রী মোটা যে শাড়ি কিংবা ধুতি জলে ভিজলে একমণ ওজনের কাছাকাছি ভারি হয়।

সৌন্দর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে দীপ্তি বলে যে —

> 'বীটোভেনের কাজ ছিল নিজের শরীরকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। এবং প্রত্যেক পুরুষ আর্টিসটের কাজই তাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের কাজ স্ত্রীলোকের আর্ট কেবল তার অনস্বীকার্য্য কর্ত্তব্য কেবল নিজেকে চরম সুন্দর করা। এর চেয়ে বড় আর্ট আর তার হতে পারে না। আর এর চেয়ে বড় কর্ত্তব্যও আর তার নেই।'[৩২]

দীপ্তির এই কথা শুনে কি আমাদের মনে হয় না এ কোন পাগলের প্রলাপ? এটাই কি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দীপ্তির সত্যিকারের বক্তব্য? এ বক্তব্য কি তাঁর স্রষ্টা আশালতার? নাকি এই বক্তব্যের ভেতরে লুকিয়ে আছে স্রষ্টার অন্য বক্তব্য। মেয়েরা শুধু শরীর চর্চা করবে। সৌন্দর্য চর্চা করবে এবং সেই সৌন্দর্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে সে অপেক্ষা করবে তার প্রিয় পুরুষটির জন্য — এ বক্তব্য, এ আকাঙ্খা কার? আজ থেকে একশো বছর আগে এমন বক্তব্যই তো ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেশিরভাগ পুরুষের; আজও সে মতের খুব হেরফের হয়েছে?

গিলবার্ট এবং গুবারের যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বের প্রয়োগ লেখায় যে আশালতা বহু আগেই ঘটিয়েছেন তার স্বপক্ষে বলা যায় যে সুখবাদ গল্পের দীপ্তির আরও কিছু বক্তব্য আমাদের সেকথাই প্রমাণ করে দেয়। দীপ্তি বলে —

> ''মেয়েমানুষ প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হতে পারে না বলে বহুজনে আক্ষপ করেন, কিন্তু মেয়েমানুষ নিজেও যদি এই নিয়ে আক্ষেপ করতে বসে তখনই জানব এটা জাতির ইতিহাস দুর্ভাগ্যের কাল উপস্থিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর শিল্পী তো তারাই। কারণ তাদের জীবনই শিল্প। সেই জীবনকে রসে, লীলায়, সৌন্দর্য্যে টল্‌টলে করে তুলবে বলেই ত তারা শিল্পী। ...একটি ফুলের মত দিন শেষে সে'ও ঝড়ে যায় কিন্তু জাতির ধারাবাহিকতায় থেকে যায় তার জীবন শিল্পের পরিচয়। আমি তাই এক এক সময় অবাক হয়ে ভাবি এখনকার মেয়েরা কতদিকেই না সচেতন হয়ে উঠেছেন। কি তাদের প্রয়োজন, কোথায়

> তাদের অভিযোগ, কোনখানে তাঁদের সমানাধিকার একচুল দমেছে এ সব নিয়েই তাদের চেষ্টা চরিত্র-ভাবনা-চিন্তার অবধি নাই। সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে আমরা কত কিছুই না দাবী করচি। কিন্তু নিজের কাছে আমরা একবারও দাবী করচি না যে, আমরা অরও সুন্দর হব, আরও সুন্দর হবে। সুন্দরতম হয়ে ওঠাই আমাদের চরম দাবী কিন্তু এই দাবীর কথা কেউ একবারও ঘোষণা করচে না।[৩৩]

দীপ্তির এই বক্তব্যে আমাদের মনে হতে পারে মেয়েদের যে সমানাধিকারের জন্য তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে যে দাবি তা হয়তো দীপ্তি সহ তার স্রষ্টা আশালতা সিংহের পছন্দ নয়। মেয়েরা শুধু সৌন্দর্য চর্চা করবে — এটাই কাম্য। কিন্তু সত্যি কি তাই?

গল্পটির শেষাংশে আমরা দেখব বসন্ত রোগের খুব বাড়াবাড়ি দেখা দিলে দীপ্তির বাড়ির লোকেরা শিমুলতলায় যাবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তাদের বাড়ির আশ্রিত দীপ্তির এক দূর সম্পর্কের মামার বসন্ত দেখা দিলে তাদের বাড়ির সাঁওতাল চাকরটি '.... হরদয়ালের শিয়রের কাছে বসে একটি কচি নিম পাতার ঝাড় তাঁর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছে।'[৩৪] (পৃ. ৩৭০ত) নিচে একখানা বই সংগ্রহ করতে এসে উক্ত দৃশ্যটি দেখে এবং সারা রাস্তা ট্রেনে যেতে যেতে দীপ্তি সাঁওতাল চাকরটার সেবার কথাই চিন্তা করতে লাগল। শেষে অল্ডাস হাক্সলির 'Jesting Pilate' বইটতে সে তন্ময় হয়ে পড়তে লাগল।

অর্থাৎ শিল্প সৌন্দর্য চর্চাই শুধু নয়, জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ম। সেই কর্ম মানুষকে বাঁচতে, বাঁচার উদ্দেশ্য বোঝাতে সাহায্য করে — এটাই আসল কথা।

'পত্র পরিচিতা' — উদয়ন পত্রিকায় ১৩৪০ এর কার্ত্তিক সংখ্যায় 'পত্র পরিচিতা' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

শ্রীমতী আশালতা সিংহের এই গল্পে আমরা দেখি উর্ম্মিলা দেবী যিনি অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি পড়ছে। কঠিন অঙ্ক কষতে তার যেমন ভালো লাগে তেমনি ভালো লাগে দাবা খেলতে, অবসর সময়ে যে যেমন আলাপনা দিতে শিখেছে তেমনি গাড়ি ড্রাইভ করতে শিখেছে। তবুও যখন তার সময় কাটে না অবসর সময়ে তখন সে নিছকই গল্প-প্রবন্ধ লেখে। তার লেখা গল্প-কবিতা পাঠককে মুগ্ধ করলে অচিরেই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে উর্ম্মিলা দেবী পরিচিত হয়ে গেল। এরপর অবসর সময়ে লেখাটা উর্ম্মিলার নেশা রূপে দেখা দিল।

উর্ম্মিলার লেখার মুগ্ধ বহু পাঠক তাঁকে চিঠিপত্র দেয়। এমন এক ভক্ত নির্ম্মল সেন। আশালতা এ

বিষয়ে লিখছেন — 'নির্ম্মলের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে মাস দুয়েক আগে। তাও মোটে চিঠিতে। কিন্তু এই চিঠির আলাপই, মাস দুয়েকের ভিতরে এত দ্রুত, এত ঘন হয়ে উঠেছে যে, মামুলী মুখোমুখি চলতি আলাপ হ'লে এইটুকু দাঁড়াতেই হয়ত বা দু'বছর লাগত।'[৩৫]

নির্ম্মল উর্ম্মিলার সম্বন্ধে যা জেনেছে বা তার সম্বন্ধে সে যা ধারণা করেছে তা কিন্তু উর্ম্মিলা যেভাবে নিজেকে নির্ম্মলার সামনে তুলে ধরেছে এ যাবৎ তাই, প্রকৃতপক্ষে উর্ম্মিলা কিন্তু তেমন নয়। কারণ উর্ম্মিলা যত্নসহকারে নির্ম্মলকে যেসব চিঠি লেখে তাতে সে নিজেকে অন্যভাবে প্রকাশ করে।

এ প্রসঙ্গে উর্ম্মিলার স্রষ্টা শ্রীমতী াশালতা সিংহ জানাচ্ছেন —

> ''চিঠিটা খামে মুড়ে, আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে করতে উর্ম্মিলা একটা তৃপ্রি নিঃশ্বাস ফেললে। লিখতে লিখতে তার মন কোথায় কতদূরে চলে গিয়েছিল। সে যেন বিধাতার মত নিজেকে সৃষ্টি করে তুলেছিল ... কারো কাছে একজনের কাছে নিজেকে এত সুন্দর করে প্রকাশ করার, এত সুকুমার ব'লে প্রতিপন্ন করতে পারাব মোহ অল্পক্ষণের জন্যে ওর মনে রঙ ধরালে। ''[৩৬]

উর্ম্মিলা যখন নিজেকে বানিয়ে তোলার খেলায় মেতে উঠেছে তখন উর্ম্মিলার দিদি তাকে নিয়ে কোলকাতার নিউ মার্কেটে শাড়ি কিনতে যায়, সেখানে উর্ম্মিলা দস্তুর মত দাম কষাকষি করে, সেখানে নির্ম্মল সেনও এসেছিল রেশমের রুমাল কিনতে। দোকানে উর্ম্মিলা দেবীর নাম উচ্চারণ হওয়ায় নির্ম্মল বাবু অবাক হন এবং উর্ম্মিলা দেবীর যেটুকু পরিচয় পান তাতে পত্রের উর্ম্মিলা দেবীর সঙ্গে একে ঠিক মেলাতে পারেন না। মেলাতে পারার কথাও নয় কারণ পত্রে তো উর্ম্মিলা নিজেকে বানিয়ে তুলেছিল।

এরপর একদিন নির্ম্মলবাবু উর্ম্মিলা কোলকাতায় থাকাকালীন তার দিদির বাড়িতে তার সঙ্গে আলাপ করতে এলে উর্ম্মিলার স্বরূপ নির্ম্মল বুঝে ফেলেন। এতে আর কিছুই হয় না শুধু উর্ম্মিলা আর গল্প লেখেনা কিংবা নির্ম্মলের সঙ্গে আর তার পত্রালাপ ঘটে না। কারণ তাদের মাঝের রোমান্সটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।

গল্পটির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আশালতা উর্ম্মিলার জীবনের দুটো দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন। একদিকে তার ভাব-কল্পনার জগৎ, অন্যদিকে তার বাস্তব সাংসারিক বুদ্ধির জগৎ। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই এ দুটো দিক থাকে। কিন্তু সাধারণ পাঠক স্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে এক করে ফেলেন।

'ভালো লাগা' — আশালতা সিংহের লেখা এই গল্পটি ১৩৪০ কার্ত্তিক-এ 'সওগাত' পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পটিতে একদিকে যেমন শহর বনাম গ্রামের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে তেমনি শহরের আধুনিক শিক্ষিত নিজস্ব জীবন, চাহিদা নিয়ে ভাবিত নারী বনাম গ্রামের আটপৌঢ়ে সকলের সুখ-সেবায় নিয়োজিত পল্লী বধূর একটি তুলনা রয়েছে।

নারী লেখকদের যে গোপন ধারার কথা গিলবার্ট এবং গুবারের তত্ত্বে পাই সেই তত্ত্ব আশালতার এই গল্পটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এই গল্পটিতে আশালতা দেখিয়েছেন পল্লীগ্রামের ছেলে সুধাংশু বিলিতি ডিগ্রী শহর কোলকাতায় প্রফেসরি নিয়ে কোলকাতারই মেয়েকে বিবাহ করে শহর কোলকাতাতেই থিতু হয়। সুধাংশুর ভাই সীতাংশু কিন্তু গ্রামেই থেকে যায় এবং জমিদারি দেখাশুনা করে। মা তারাসুন্দরী বড় ছেলের মনোমত বিবাহ দিতে না পারলেও ছোট ছেলে সীতাংশুর বিয়ে দেন পল্লীবাংলার একটি সুলক্ষণা মেয়ের সাথে।

মা তারাসুন্দরী গত হবার পর ভাই সীতাংশু দাদা সুধাংশু এবং বৌদি ছায়া দেবীকে গ্রামে নিয়ে আসে মাতার শ্রাদ্ধশান্তি উপলক্ষ্যে। ম্যালেরিয়া, কুসংস্কারপূর্ণ গ্রাম সম্বন্ধে ছায়ার কোন ভাল ধারণাই ছিল ন শুধুমাত্র গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা বাদ দিয়ে। কিন্তু আসার পর থেকেই ছায়া উপলব্ধি করে ছোট ভাজ সবিতার আন্তরিকতা; সকলকে আপন করে নেবার ক্ষমতা তাকে মুগ্ধ করে।

স্নান-আহ্নিক না করে খাবার খাওয়া যায় না এমন ধরণের কুসংস্কার ছায়া না মানলেও—

> '... তাহার চেয়েও অল্প বয়সের এই যে মেয়েটি শ্রাদ্ধ বাড়ীর সুবিপুল কর্ম্মভারের মধ্যে অহোরাত্রি নিমজ্জিত থাকিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের আগে প্রায় কোনদিনই জলগ্রহণ করে না আজ তাহারই কাছে এই কথাটা স্বীকার করিতে প্রথম যেন সে লজ্জা পাইল।'[৩৭]

গ্রামের সেবা পরায়ণ কর্মকুশল নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন সবিতাকে বড় করে দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত শহুরে অধুনিক আত্মসচেতন ছায়াও তাকে মহৎ আসনে বসিয়ে অনুসরণ করার কথা ভেবেছে। এটাই তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চায়। কিন্তু সত্যিই কি লেখিকার বক্তব্যও তাই?

'সুরমার সংযম' — আশালতা সিংহের লেখা এই গল্পটি ১৩৪০-এর পৌষ-এ বিচিত্রা পত্রিকায় বের হয়েছিল।

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরমা। সুরমা শুধু সুন্দরী নয়, সে গুণবতী। আশালতা জানাচ্ছেন - 'সে সেতার বাজাতে পারে, চেলো শিখচে, কীর্ত্তন গাইতে পারে, ইংরেজীতে কথা কইতে পারে। কি পারে না বলো?'[৩৮] (পৃ. ৩৯২) সুরমার মা পল্লীগ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে তার শৈশব যেমন অন্ধকারে কেটেছে বলে তিনি মনে করতেন তার আঁচও যেন তার মেয়ে সুরমার জীবনে না লাগে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন।

সুরমার পিতার আর্থিক অবস্থা যথেষ্টই ভালো ছিল। কাজেই যতই টাকা লাগুক সুরমার শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি এতটুকু কার্পণ্য করলেন না। সুরমাকে ফ্রেঞ্চ শেখাতে এলেন হরলাল বসু। হরলালের ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস। লেখিকা অশালতার কথায় —

> 'চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, কালচারের একটা চক্‌চকে পালিশ। হরলাল ভাষা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ামানুষের নানারকম মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু করলে।'[৩৯]

হরলালের শিক্ষা-দীক্ষা উন্মোচিত হল। বিশেষত হরলাল সর্বদা বলতেন যে সবদিক দিয়েই পুরুষ-মহিলা সমান। ব্রতপালন-সংযম শুধুমাত্রমেয়েদের জন্য হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। হরলাল সুরমাকে প্রশ্ন করে — 'মেয়েরা যদি ঘোড়ায় চড়ে, বাইকে চড়ে কেমন ভালো হয় বলত?''[৪০]

এমনি করে হরলালের কথাবার্তা যখন সুরমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে ঠিক তখনই সুরমার মা বিন্দু দেবী তার মেয়ে সুরমার জন্য ধনী পাত্র দেখে বিয়ে দেয় যদিও পাত্রের বয়স সুরমার তুলনায় অনেকটাই বেশি।

সুরমার স্বামী বেশ ধূর্ত্ত, বিয়ের আগে থেকেই সে যথেষ্ট মেয়ে ঘেটেছে তাই মেয়েদের সম্পর্কে তার বেশি কৌতূহল নেই। সে বেশ রাত করে ঘরে ফেরে, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার বজায় রাখতে সুবোধ তার স্ত্রী সুরমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিল কারণ সুবোধ জানত তার স্বাধীনতার পথে একমাত্র জোরালো বাধা হতে পারে স্ত্রী। কাজেই সেই সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটিত করতে স্ত্রীর বদ্ধমূল সংস্কারগুলি প্রথমেই নাড়িয়ে দিল সে।

সুরমা তাই যতই মি. লাহিড়ীর সঙ্গে গ্লোবে যান, এম্পয়ারে যান, কিংবা রজত চক্রবর্তীর সঙ্গে বঙ্গ নিকেতনে গিয়ে দেশী থিয়েটার দেখুক ওর প্রকৃতিতে যে একটা সহজাত রুচিজ্ঞান তাই ওকে, ওর স্বভাবকে সংযত রেখেছিল।

এমনই যখন চলছিল তখন চন্দন নগরের রেল স্টেশনে একদিন সুরমার সঙ্গে তার শিক্ষক হরলালের দেখা হল। হরলাল একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর এজেন্ট হয়েছে। বহুদিন পর হরলালের দেখা

পেয়ে সুরমার খুব আনন্দ হল। হরলালের কাছে পুনরায় সুরমা ফ্রেঞ্চ শিখতে শুরু করছে। হরলালের সঙ্গ ঘুতেও যায় বইওকেনে।

প্রগতিশীল অধুনিকা সুরমার সহজ বন্ধুত্বকে হরলাল সুরমার তার প্রতি অনুরাগ বলে ভুল করে। বিশেষ করে হরলালের মনে সুরমা সম্পর্কে বিশেষ দুর্বলতার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সুরমা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করলেওসে যথেষ্ট সংযত এবং রুচি জ্ঞানসম্মন্ন। অচিরেই সে হরলালের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেয়।

শিক্ষিত যুবক হরলালের তুলনায় সুরমার মত গৃহবধুর ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্যবোধ অনেক বেশি পাঠকের শ্রদ্ধা পায়।

‘নারী চরিত্র’— শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা ‘নারী চরিত্র’ গল্পটি উদয়ন পত্রিকায় ১৩৪১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পটিতে দেখি মাধবীকে। মাধবী দরিদ্র ঘরের মেয়ে। ছোট থেকেই মাধবীর মা নেই, বাতে প্রায় অশক্ত পিতা এবং কয়েকজন ছোট ছোট ভাই বোন আছে। মাধবী গৃহের প্রায় সমস্ত কাজ করত, ‘সংসারের সকল দায়িত্ব এবং ঝঞ্ঝাট মাধবীর উপর।’[৪১]

সমস্ত বাড়ির কাজকর্ম্ম করেও মাধবী রাত জেগে পড়াশুনা করত এবং নিজের চেষ্টায় অনেক লেখাপড়াও শিখেছিল তার পিতার কাছে সে বেহালাও শিখেছিল। কেরানী পিতার মেয়ে মাধবী শুধু গুণবতীই ছিলেন না, ছিলেন সুন্দরীও। তাই ধনী ঘরের বান্ধবী ইন্দিরার যখন ধনী পরিবারে বিয়ে হয় তখন মাধবী তার ভাইবোনকে আগলে সমস্ত সংসারের দায়িত্ব মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছে। একসময় ইন্দিরার তার দেওরের সঙ্গে মাধবীর বিয়ের প্রস্তাব করলেও মাধবী তা নাকচ করে দেয়।

মাধবীর পরিবারের প্রতি মাধবীর কর্তব্য, নিষ্ঠা দেখে ইন্দিরার মস্তক তার বান্ধবীর প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে যেত। বেশ কয়েকবছর পর ইন্দিরা যখন বাপের বাড়িতে এসে জানতে পারে মাধবী এক মাঝবয়সী বিপত্নীক ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি অনুরক্ত তখন ইন্দিরা বিস্ময়ের সঙ্গে খানিকটা ঘৃনাবোধও করে। ইন্দিরা মাধবীকে বোঝাতে চায় যে ম্যাজিস্ট্রেট আদৌ মাধবীকে বিয়ে করবে না। কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায় ইন্দিরার আশঙ্কাই সত্যি হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের বদলি হয়েছে, সে ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে। মাধবী ইন্দিরাকে জানায় ‘তবে তাঁর ধর্ম্ম তাঁর কাছে। যা উচিত তা তিনি করবেন বইকি।’[৪২]

মাধবী-র মনের এই অবস্থা সম্বন্ধে ইন্দিরা খুব ভালো না বুঝলেও ইন্দিরার স্বামী কিন্তু যথেষ্ট

সহমির্মতার সঙ্গে বিষয়টি উপলব্ধি করে ইন্দিরাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ইন্দিরার স্বামী মহিম বলে —

''কতো দিনের কতো পিপাসা দমন করবার পরে আজ তার অন্তর প্রকৃতি
নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছে, তার হিসাব করা কি এতই সোজা মনে করে?''[৪৩]

মহিমের মতো একজন পুরুষের মুখে কথাটি বসালেও লেখিকা আশালতা কিন্তু পরিবারের জোয়াল টানতে টানতে ক্ষয়ে যাওয়া মেয়েটির জৈব চাহিদা কিংবা পুরুষের সঙ্গলাভের আকাঙ্খার কথাই বলতে চেয়েছন।

'মঞ্জুরীর বেহায়াপণা' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা এই গল্পটি ১৩৪১ এর জৈষ্ঠ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দেওয়ানী কোর্টের বড় উকিল সুরসুন্দরের ছোট মেয়ে মঞ্জুরী। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে সুরসুন্দরের সাহেবী আচার আচরণের পরিবর্তে স্ত্রীর আচার নিয়মকে নিজের জীবনে স্থান দিলেন। সুবসুন্দর এখন গঙ্গাস্নান করেন, শিখা রাখেন, আহ্নিক, জপতপ করেন, নিরামিষ রান্না খান।

বড় মেয়ের স্ত্রী বেঁচে থাকতেই কোলকাতায় বিয়ে দিয়েছিলেন। বারো বছরের মঞ্জুরীকে স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ীতেই বেদ-উপনিষদ পড়ানোর জন্য ব্যস্ত হলেন। মঞ্জুরী কিন্তু এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারল না। সে কোলকাতায় দিদির বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করল। সেখানেই ডায়োসেসন স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে তার পড়াশুনা চলতে লাগ। নিঃসন্তান দিদি-জামাইবাবুও তাকে যথেষ্ট স্নেহ মমতা দিয়ে মানুষ করতে লাগলে। ইতিমধ্যে সে সতেরো-য় পা দিয়েছে, দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে দেখা হল ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক নরেশ মৈত্রর সঙ্গে। দুজনেই একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হল।

এ বিষয়ে মঞ্জুরীর পিতা কিছুতেই প্রথমে রাজি হলেন না। কারণ নরেন জাতে বারেন্দ্র শ্রেণী এবং মঞ্জুরীরা রাঢ়ী শ্রেণী। জামাইবাবু সীতেশের কোলকাতার বাড়িতেই বিবাহের আয়োজন হতে লাগল। যদিও বিয়ের দিন শেষ পর্যন্ত সুরসুন্দর এসে মঞ্জুরীকে আশীর্বাদ ও সম্প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন।

মঞ্জুরী নরেশের এই অসবর্ণ বিবাহে সমাজে নানা সমালোচনার ঝড় ওঠে। মহিলা সমিতিতেও সেই গুঞ্জন আলোচনা চলে। মহিলা সমিতির সম্পাদক সুমিত্রা দেবী মঞ্জুরীর এই নিজের পছন্দ অসবর্ণ বিবাহ করাকে নিন্দা করলেও তাদের দুজনকে একত্রে দেখে হঠাৎ তার পূর্বস্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। সুমিত্রা দেবীর মনে পড়ে যায় তার পূর্ব জীবনের প্রেমিকের কথা। অভিভাবকদের মত না থাকায়

সুমিত্রার অসবর্ণে প্রেমিকের সাথে বিবাহ হতে পারেনি। যদিও সুমিত্রা এসব কথা ভাবার সময় পান না। কারণ তাকে নানান সামাজিক কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। মনে যাই ভাবুন না কেন বাড়ির ড্রইংরুমে বসে অতিথিদের সামনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তিনি বলে চলেন —

> ''ঠিকই বলেচেন, মঞ্জুরীর বেহায়াপনা আমাদের মেয়েদের আদর্শ হয়ে না দাঁড়ায়। ওর দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখ থেকে যত সরে যায় ততই মঙ্গল।''[৪৪]

সুতরাং দেখা যায় সুমিত্রা দেবী মনে মনে যা ভাবেন মুখে তা বলেন না। সামাজিক পরিবেশের চাপে অনেক সময় নিজস্ব মনোভাব চেপে রাখতে হয়। মেয়েদের নিজস্ব স্বর যে আদৌ থাকে না গল্পটির মধ্য দিয়ে আশালতা সেদিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'ছেঁড়া মোজা' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা ছেঁড়া মোজা গল্পটি ১৩৪১ সালে 'সোনার কাঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পে দেখি বেলা এবং মিনিকে। উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে বেলার সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মিনির খুবই বন্ধুত্ব। মিনুর লেখাপড়ায় অত্যন্ত অনুরাগ, ক্লাসে সে সব সময় ফাস্ট হয়। বেলার দাদা বিলেত থেকে ব্যরিস্টার হয়ে এসেছে। সেই উপলক্ষ্যে বেলাদের বাড়ির পার্টিতে মিনু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। গরীব ঘরের মেয়ে বলে মিনুর পার্টিতে যাবার মত কাপড় চোপড়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মায়ের বিয়ের আমলের যত্নে রাখা কাশ্মিরী শাড়ি - আর দিদির বড় জুতো পায়ে ঢিলা হলে বাক্সে রাখা ছেঁড়া পুরানো মোজা প'রে জুতো পরে মিনু। বেলাদের বাড়ির পার্টিতে মিনির মুখে সুন্দর আবৃত্তি শুনে এবং তার সরল সপ্রতিভ ব্যবহার দেখে বেলার বাড়ির সকলে মুগ্ধ হন, বিশেষ করে বেলার পিতা কৃষ্ণনাথবাবু। মিনির পায়ে যে ঐ ছেঁড়া মোজা ছিল সেটাও বেলার পিতা কৃষ্ণনাথবাবু লক্ষ্য করেছিলেন। ধনী পরিবারের মেয়ে না হয়েও তার সপ্রতিভ ব্যবহার-চালচলনে মুগ্ধ হয়েছিলে কৃষ্ণনাথবাবু। কৃষ্ণনাথবাবু তার ব্যারিষ্টার ছেলের জন্য মিনির পিতার কাছে মিনির জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

মিনির পিতা কিন্তু মিনির লেখাপড়ার কথা না ভেবে মিনির বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যান। বড় ধনী ঘরে বিয়ে হতে পারলেই যেন মেয়েদের জীবন সার্থকতা পায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই ধরনের মনোভাব লেখিকা আশালতা সিংহকে বিচলিত করেছিল।

'প্রভাতের অশ্রুজল' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'প্রভাতের অশ্রুজলে' গল্পটি ১৩৪২

এ আনন্দবাজার পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বিনা খাটুনিতে পাওয়া অতিরিক্ত টাকা-পয়সা যে মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে ভোঁতা করে দেয় সেকথাই বলার চেষ্টা করেছেন লেখিকা আশালতা তাঁর এই গল্পটির মধ্য দিয়ে।

গল্পে দেখি জমিদার বাড়ির মেয়ে অনিমার বিয়ে হয়েছে মধ্যবিত্ত ঘরে হরনাথের সঙ্গে। অতিরিক্ত টাকা না থাকলেও হরনাথ স্ত্রীকে মান-মর্যাদার সঙ্গে সুখেই রেখেছেন। অন্যদিকে অনিমার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বাবার বাড়িতে গিয়ে অনিমা দেকে সেখনে মানুষের অলসতাপূর্ণ জীবন-যাপন, কৃত্রিম বড়লোকি চাল, বাড়ির কাজের লোকের প্রতি অমানবিক দুর্ব্যবহার, এমনকি ছেলেরাও মা কে সমমান দিয়ে কথা বলতে যেন ভুলে গেছে।

অনিমার মেজ ভাই হীরেন কলেজের আই.এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, সে ঠিক করেছে কেলাকাতায় হস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করবে। তার মতে —

> ‘এই বাড়ী আর এই বাড়ীর আবহাওয়ায় থেকে মানুষের কিছু কখনো হতে পারে না, হবেও না। উঃ কী বিষাক্ত আবাহাওয়া! কারো কোন কাজ নেই জীবনের উদ্দেশ্য নেই।’’[৪৫]

ছেলের কথায় মা অত্যন্ত আঘাত পান তার চোখে জল দেখা দেয়। অনিমা মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখ দেখে কাতর হয়ে পড়ে। অনিমা মায়ের জন্য দুঃখ বোধ করলেও কিছু সময় পর দেখে মা কটুভাষায় বামুন ঠাকুরকে বকাবকি করছেন, আবার সন্ধ্যাবেলা অতিথিবর্গ এলে মা তাদের সঙ্গে রেডিও সেট, মোটর কেনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করছেন।

এসব দেখে শুনে অনিমার মনে হল তার বাপের বাড়ির আবহাওয়া সত্যিই কৃত্রিম, অমানবিক তাই তার স্বামীর খেটে তৈরী করা ছোট্ট গৃহটির জন্য মন কেমন করতে লাগল।

‘একটি প্রশ্ন’ — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা এই গল্পটি ১৩৪২-এ গল্প-পুষ্পাঞ্জলির শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

গল্পে দেখা যায় কোলকাতার ধনী ব্যরিস্টার রায় মহাশয়ের কন্যা মীনার বিবাহ ঠিক হয়েছে বিলেত ফেরত সুনীলের সঙ্গে। বিলেত থেকে পড়াশুনা শিখে এলেও সুনীল কখনো সাহেবী পোশাক পরে না। আধুনিক মীনা কথা বার্তা চাল চলনে খুবই স্টাইলিস্ট, তার মধ্যে যথেষ্ট উদারতাও রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে অভাব ছিল শুধু সহানুভূতি এবং সহিষ্ণুতার। বিশেষত গ্রাম পাড়াগায়ের অমার্জিত

সংস্কৃতির প্রতি তার ছিল প্রবল ঘৃণা। আসলে গ্রাম্য সমাজের হাল হকিকত সম্পর্কে সে ছিল একেবারেই অজ্ঞ ।

মীনার এই অজ্ঞতা দূর হয় তার পিসতুতো দিদি বিমলাকে দেখে — যে পাড়াগাঁয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকে। বিমলা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসারের ঘানি টানে, স্বামী, সন্তান সকলের সেবায় সে এমনই মগ্ন থাকে যে নিজের সাধ আহ্লাদের কথা তার মনে মুহূর্তের জন্য স্থান পায় না।

মীনা যখন বিমলার মতো মেয়েদের অবস্থাকে সহানুভূতি- ধৈর্যের সাথে উপলব্ধি করতে শেখে তখনই মীনা বোঝে এতদিন তার স্বামী সুনীল তার মধ্যে যে জিনিসের অভাব দেখেছিল তা আসলে কী। এরপর থেকে হয়তো সুনীল আর সেকথা বলার সুযোগ পাবে না। কারণ মীনা নিজেকে বদলে নিয়েছে।

'প্রিয়ার ঘর' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'প্রিয়ার ঘর' গল্পটি ১৩৪৩ এর আনন্দবাজার পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পে পাই অবনীশকে, মেধাবী এবং পড়ালেখার প্রতি একনিষ্ঠ, মেয়েদের থেকে শতহস্ত দূরে বিয়ের ব্যাপারেও উদাসীন। তবে মা-মাসির কৌশলে মাসির জায়ের মেয়ের সঙ্গে অবনীশের বিবাহ হয়। অবনীশের স্ত্রী অমিয়া। অমিয়া সুন্দরী এবং গৃহকর্ম্মনিপুণা। অবনীশ যখন বিবাহের পূর্বে মাসির বাড়িতে অমিয়ার ঘরে ঢোকে তখন সেই ঘরের চারদিকে যে সৌন্দর্য এবং কর্মকুশলতার চিহ্ন দেখেছিল তাতেই সে অমিয়ার মধ্যে সেবা পরায়ণা ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে খুঁজে পেয়েছিল। তখন যদিও অমিয়াকে সে দেখেনি।

গল্পটিতে অবনীশ মেধাবী পড়ুয়া হলেও নিজের কাজকর্ম নিজে করার তার কোন অভ্যাসই ছিল না তুলনায় অমিয়া অনেক বেশি গৃহকর্ম্মনিপুণা এবং সেইসঙ্গে বুদ্ধিমতীও।

'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম' — গল্পটির প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না।

দেশ যখন পরাধীন এবং সমাজে যখন মেয়েরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না এমন পরিস্থিতিতে সুপ্রভাদেবী স্বভাবতই বিচলিত বোধ করেছেন। অহরহ তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরছে কীভাবে এই মহাসঙ্কটময় অবস্থা থেকে দেশের, দেশের মেয়েদের মুক্তি ঘটবে। এমন সময় স্বামী সুবিমল প্রকৃতির সূর্যাস্তের অপরূপ শোভা দেখতে চাইলেও স্ত্রী সুপ্রভাদেবীর তা ভালো লাগছে না।

সুপ্রভা-সুবিমলের বিয়ে এক বছরও পার হয়নি তাই সুবিমল স্ত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সুপ্রভা কিন্তু প্রেম-প্রীতির চেয়ে মেয়েদের উত্তরাধিকার স্বত্ব নিয়ে যে বিল তৈরী হচ্ছে তাই নিয়েই অধিক চিন্তিত।

তাই সুবিমল যখন বলে —

> ''... দেখ সুপ্রভা তোমরা আজকালকার মেয়েরা ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতার দাবী ইত্যাদি বড় বড় কথা নিয়ে যতই মাতামাতি করতে থাকো আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত উদ্ধত ব্যক্তিত্বকে একটি নম্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে নত করেই তবে লোকে প্রেমের রাজ্যে ঢুকতে পায়।''[৪৬]

তখন এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রভা জানায় যে কোন ভালোবাসার মোহেই সে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে পারবে না।

যদিও গল্পটি পড়ে আপত দৃষ্টিতে মনে হবে লেখিকা শ্রীমতী আশালতা সিংহ সুপ্রভার মতো নারীর মধ্যে স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে স্বামী সুবিমলকে তুলনায় অনেক শান্ত, বিচক্ষণ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। মেয়েদের প্রেমে সর্বস্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তি ঘটবে — এমত সুবিমলের, আর এতে যেন আশালতারও যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যি কি তাই?

সুপ্রভা শুধুমাত্র নিজের স্বামী-সংসারের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারছে না। এতদিন ধরে সমাজে যেসব তথাকতিথ সুগৃহিনীরা ছিলেন যারা স্বামী-সংসারঅন্ত প্রাণ সেই গতানুগতিক কর্তব্য পরায়ণ নারী থেকে অনেকটাই আলাদা সুপ্রভার মতো নারী। গিলবার্ট এবং গুবাবের মতে এরাই হয়তো স্বৈরিনী নারী। আর এই স্বৈরিনী নারীর মধ্য দিয়েই হয়তো আশালতা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'অপক্ষপাতী কৌতূহল' — ১৯৩৭ সালের ১২ জুন দেশ পত্রিকায় শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'অপক্ষাপাতী কৌতূহল' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

গল্পটিতে দেখি মাধবী তার ডাক্তার স্বামী বিজয়ের সঙ্গে কোলকাতায় থাকে। বিজয়ের ডাক্তার হিসাবে যথেষ্ট প্রসার রয়েছে তাই সে একদম সময় পায় না। মাধবী ঘরে একলাই থাকে। মাধবীর ভাই নীরেন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ দিয়ে দিদির কাছে কোলকাতায় বেড়াতে এসেছে। পিঠোপিঠি

দুই ভাই বোন বন্ধুর মত গল্প গুজব করে কাটায়, ভাই কাছে থাকায় এসময় মাধবীর দিনগুলো বেশ আনন্দে কাটছে। জীবন সম্বন্ধে নীরেনের একটা অপক্ষাপাতী জিজ্ঞাসা রয়েছে। সে সব কিছু কে নিরপেক্ষভাবে দেখার পক্ষপাতি। মেয়েদেরকেও সে এভাবেই পরখ করতে চায়। মেয়েদের প্রসঙ্গে দিদি মাধবী নীরেনকে জানায় যে, আজকালকার মেয়েরা বড্ড বেশি আত্মসচেতন, এরা আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেকে উন্মোচন করতে পারে না বলেই এদের দাম্ভিক মনে হয়।

নীরেন তার পরীক্ষার পর দিদির বাড়িতে ঘুরতে এলে সেখানে দিদির খুড়তুতো ননদ বরুণার সঙ্গে তার আলাপ হয়। 'অপক্ষাপাতি' কৌতূহল নিয়ে বরুণাকে নিরীক্ষণ করলেও বরুণার প্রতি নীরেনের পক্ষপাত কৌতূহলই জাগে আর বরুণারও নীরেনকে ভালো লাগে। তাই বরুণাও তার স্বাভাবিক আন্তরিকতা নিয়েই নীরেনের সঙ্গে দেখা করতে মাধবী বৌদির বাড়িতে আসে, গান করে; নীরেনও মাধবীর গানের তালে বেহালা বাজায়।

গল্পটিতে দেখি মেয়েরা যে অহং সর্বস্ব হয় আন্তরিক হয় না তার কারণ কিন্তু তাদের আধুনিকতা নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বময় ঝক্‌ঝকে পুরুষের সংস্পর্শে না এলে মেয়েরাও নিজেদের আন্তরিকতার সঙ্গে মেলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করে। তাই হয়েছে বরুণার সঙ্গে। আবার বরুণা যখন নীরেনের মত ব্যক্তি ত্বময় পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে তখন নিজেকে আন্তরিকভাবে মেলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। সমাজ মেয়েদের কাছে দাবি করে কিন্তু মেয়েদেরও যে দাবি দাওয়া থাকতে পারে সে কথা সমাজ ভাবে না।

'প্রেমের রূপ' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'প্রেমের রূপ' গল্পটি ১৯০৭ সালের ৩১ জুলাই দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পটিতে দেখা যায় উচ্চবিত্ত ঘরের পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকা মেয়ে রেখা ব্যানার্জী এবং গরীব ঘরের পড়াশুনায় ভালো মেয়ে রেবা রায়। রেখা এবং রেবার এক সময় খুব বন্ধুত্ব ছিল। এরপর রেবার বিয়ে হয়ে যায় অজ পাড়া গাঁয়ে। রেখা তার বাবার সঙ্গে চলে আসে কোলকাতায়। কোলকাতার লোক সমাজে মিশে রেখা বুঝতে পারে গরীব পাড়া গাঁয়ে বিয়ে হওয়া রেবার সঙ্গে তার আর বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব নয়।

রেবার মনটি কিন্তু আগের মতোই আছে। সে ভাবে কোলকাতায় গিয়ে একবার সে বন্ধু রেখাবার সঙ্গে দেখা করবে। ইতিমধ্যে রেখার বিয়ে হয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার চৌধুরির সঙ্গে।

বড়দিনের ছুটিতে স্বামী রমেণের সঙ্গে রেবা কোলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে এলে বন্ধু রেখার বাড়িতে যায় দেখা করতে। বহু দিন পর বন্ধুকে দেখবে বলে রেবা উদগ্রীব হয়ে থাকে। চাকরের মুখে বন্ধু

রেবা দেখা করতে এসেছে জেনেও রেখা বেশ কিছুক্ষণ পরে একা বেরিয়ে এসে দেখা করে ঠিকই কিন্তু মেট্রো শোতে যাবার অজুহাত দিয়ে সে তাড়াতাড়ি অতিথিকে বিদায় দিয়ে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এতদিনে রেবা বুঝতে পারে রেখার মনোভাব।

'গবেষণা' — শ্রীমতী আশালত সিংহের লেখা 'গবেষণা' গল্পটি ১৩৪৪ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পে দেখা যায় ইলা গান জানা আধুনিক মেয়ে। ইলার স্বামী সত্যেন কৃষি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক। সেইসঙ্গে রিসার্চ করছেন কৃষিকার্য্যের উন্নত প্রণালী বিষয়ে। সত্যেনদেবের পৈতৃক জমিদারীও আছে যদিও সেখানে সে কস্মিনকালে একবারই গিয়েছিল। স্ত্রী ইলা শহুরে সামাজিকতায় হাঁপিয়ে উঠেছে তাই স্বামীকে বলে ''... একটা কথা কোনদিন ভেবেচ কি, যাদের জীবন যাত্রার উন্নতি, যাদের চাষ করবার প্রণালীর কথা এত করে মাথা ঘামিয়ে লিখচ, তাদের তুমি কতটুকু জান?''[৪৭]

সত্যেনও বিষয়টা উপলব্ধি করে তাই স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য সে তার নিজের গ্রামের বাড়িতে আসে। বহুদিন পর শহুরে ব্যবস্তা থেকে দূরে সরে গ্রামের পথ দিয়ে আসতে আসতে স্বামী স্ত্রী দুজনেরই খুব ভালো লাগছিল।

পল্লীগ্রামে বসবাস করে পল্লীবাসীদের সংস্পর্শে এসে ইলা বুঝল পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা, অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূরাবস্থা। ইলা সাধ্যমত পল্লীবাসীদের খারাপ অবস্থা দূর করার চেষ্টা করেও পারেনি। কারণ সৎ পরামর্শ তারা নেবেই না তাদের অজ্ঞতার জন্য। যদিও ইলার স্বামী কিন্তু সে পথও মাড়ায়নি সে শুধু তার থিসিস নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে।

গল্পের শেষে দেখা যায় ইলা স্বপ্ন দেখছে তার স্বামী 'থিসিস লিখে মস্ত এক উপাধি পেয়েছে'[৪৮] । ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় তাই সত্যেনও ভাবে অচিরেই স্বপ্নটা সত্যি হবে।

ইলা কিন্তু আরও স্বপ্ন দেখেছিল গ্রামের মানুষগুলো যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। গ্রামের হতভাগী মহিলারা একইভাবে চোখের জল ফেলছে।

ইলার অবচেতন মনের ঐ স্বপ্ন যে ইলার ভাবনারই ফল তা তো বলাই বাহুল্য। লক্ষণীয় বিষয় স্ত্রীর কথায় সত্যেন পল্লীগ্রামে এসেছে ঠিকই কিন্তু পল্লীবাসীদের সুখ-সুবিধা নিয়ে সে কিন্তু তেমন মাথা ঘামায়নি। বরং ইলাকেই গ্রামবাসীদের দুঃখ, দুর্দশা বিচলিত করেছে।

‘বিরহ’ — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা বিরহ গল্পটি ১৯৩৭ সালের ৯ অক্টোবর দেশ পত্রিকায় বের হয়েছিল।

গল্পে দেখি সুজিতের মাস ছয়েক হল বিবাহ হয়েছে কোলকাতারই ভবানীপুরের মেয়ে মণিমালার সঙ্গে। সুজিতের বাড়িতে চা-এর সান্ধ্য আড্ডায় নীপেশ, অমিয় যেমন আসে তেমনি তাদের তুলনায় একটু বেশি বয়সী যতীনদাও আসেন। বর্ষার মাঝামাঝি গোল টেবিলে বসে সন্ধ্যায় সকলে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল তা হল প্রেম এবং বিরহেই নাকি প্রেমের আসল রূপ পরিস্ফুট হয়। কালীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সকল মহান কবিই এ বিষয়ে একমত।

বয়স্ক যতীন বসুর স্ত্রী দশ দিনের জন্য বাবার বাড়িতে গেলে যতীন উপলব্ধি করে বিরহ অনুপস্থিতিতে ঘর-সংসার একেবারে অচল। সমস্তই কেমন ফাঁকা লাগে। তার চেয়েও বড় কথা হাতের কাছে সব জিনিস এগিয়ে দেওয়া, খাওয়া-শোওয়ার যত্ন নেবার লোকটি না থাকায় যতীন বড়ই অসুবধায় পড়েছে। এদিকে সুজিত তার স্ত্রী মণিমালাকে বলে যে বছর দেড়েকের জন্য সে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.আরসিপি-র জন্যে পড়তে যেতে চায় এতে পড়াও হবে আর বিরহ কী জিনিষ সেটাও দুজনে উপলব্ধি করতে পারবে।

বুদ্ধিমান মণিমালা এর মধ্যে এলাহাবাদে দিদির ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য ওখানে একাই যায় কারণ সুজিতের ডাক্তারীর প্রাকটিস আছে। সাতদি হল মণিমালা দিদির ওখানে গেছে। এরই মধ্যে সুজিতের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সে স্বীকার করে ‘কথা সাজিয়ে বলতে আমদের ভাল লাগে, তাই বলি।’[৪৯]

কবির কবিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই বিরহ নয় মিলনেই বাঁধা পড়তে চায় যতীন থেকে সুজিত সকলেই।

‘পছন্দের জের’ — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা ‘পছন্দের জের’ গল্পটি ১৩৪৪ এর আশ্বিন-এ মাসিক বসুমতী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পে দেখি হাইকোর্টের তরুণ ব্যারিস্টার নন্দনাল সোম বেশ আধুনিক মানসিকতার। তিনি নারীর পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী কেউই যেন কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে এই তার মত।

নন্দর দিদি পশ্চিমের গঙ্গাতীরবর্তী এক শহরে থাকে। জামাইবাবু ওখানেই ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ

কর্মচারী। দিদির বাড়ি বেড়াতে এসে নন্দ দিদির ননদ উমাকেও দেখে। উমা কোলকাতায় হোস্টেলে থেকে বেথুন কলেজে আই.এ পড়ে। দিদির কাছে এসে নন্দ বহুদিন মেয়েদের হাতের নিপুণ সেবা যত্ন পেল। দিদি এবং তার ননদ উমা দুজনেই নন্দর নানান সেবা-সুবিধা দানে তৎপদ। এতে বিদেশ থেকে শিখে আসা দেখে নারী স্বাধীনতার পূর্ণ না দেখলেও এতদিনের এই ভাবনা চিন্তাগুলো অর্থহীন মনে হল। আশালতার মতে, —

> ''নারীর আর একটি যে রূপ এতকাল প্রায় তাহার অপরিচিত ছিল, সেই সেবায় ন্র, স্নিগ্ধতায় এবং সমর্পণে সুমধুর ভাবটি আকাশের ঐ ঘন নীলের সহিত বাতাসের মৃদু আন্দোলনের সহিত মনের উপর রেখাপাত করিতে লাগিল।'[৫০]

নন্দ যখন উমাকে একালের মেয়ে হিসাবে ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কথা বলে তাকে উদ্দীপিত করে তখন উমা জানায় — '...কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে যদি তারও চেয়ে বড় কিছু পাওয়া যায়, তো দেব না কেন?'[৫১] পাত্রী নির্বাচন করতে নন্দর দিদি যখন হাইহিল পড়া, কথায় কথায় ইংরেজী বুলি আওড়ানো রোগাটে আধুনিকা এষা পালিতকে পছন্দ করে তখন নন্দর কিন্তু তাকে মোটেই পছন্দ হয় না।নমনীয়, সেবা-পরায়ণ এবং একটু প্রাচীন মতাদর্শে বিশ্বাসী উমাকেই নন্দর পছন্দ।

নন্দর দিদিও তাই উপলব্ধি করে — ''এখন দেখছি পুরুষমানুষে মুখে যাই বলুক, তারা মেয়েদের কাছ চিরদিন সেই একই জিনিষ চেয়ে এসেছে।''[৫২] আর লেখিকা আশালতা এই একটি বাক্যে পুরুষের জাত চিনিয়ে দিলেন।

'ওদের বিবেক বুদ্ধি' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'ওদের বিবেক বুদ্ধি' গল্পটি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'রঙ্গিন আকাশ' এ প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পে দেখি টাউন হলে একজন নামজাদা পণ্ডিতের আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান বিষয়ে বক্তৃতা শোনার পর রমেন, সোমনাথ, হারীন প্রমুখ কলেজ পড়ুয়া বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দেয় আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবকে নিয়ে।

বিজ্ঞানের দুটো দিক রয়েছে — ভালো দিক এবং মন্দ দিক। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কখনোই বিজুানের খারাপ প্রয়োগ করবে না। এ প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ জানায় যে সে খুব কাছ থেকে গ্রামের মানুষজন দেখছে। সে তাদের কাছে একটি গল্প বলে। কীভাবে গ্রামের মানুষ অভাবের সংসারে ছেলের চিকিৎসা না করিয়ে সিনেমা দেখে পয়সা নষ্ট করে। তাই ঐসব অভাবী মুর্খ-চাষীদের সচেতন করতে সর্বপ্রথম

প্রয়োজনে তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হবে। বুদ্ধির মুক্তি ঘটলে বিবেকবোধও জাগ্রত হবে। বিজ্ঞানের উন্নতিকে কাজে লাগাতে হলে পল্লীগ্রামের হত দরিদ্র মুর্খ-মানুষগুলির প্রাথমিক বিষয় অর্থাৎ — খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে প্রথমে সুনিশ্চিত করতে হবে।

'ছ'বছর পরে' — গল্পটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৪ এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে শ্রীমতী আশালতা সিংহ দেখিয়েছেন দুই বোন সুনীতি এবং সুধীরাকে।

সুধীরা দিদিকে চিঠি দেয়; সে শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুর থেকে এক মাসের জন্য বাপের বাড়ী এসেছে; এ সময় দিদি সুনীতিও যদি আসে তবে দুই বোনে দেখা হতে পারে। চিঠিটা পড়তে পড়তে সুনীতির শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। দীর্ঘ ছয়-সাত বছর সুনীতির বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

অনেক দিন পর দুই বোনের দেখা হল বাপের বাড়িতে। কিন্তু দুজনেই বুঝতে পারল যে আগেকার মত কিছুই আর নেই, লেখিকা আশালতার ভাষায় —

> ''অতীত জীবনটা কল্পনার মধ্যে আছে, কিন্তু ঠিক তাহারই মাঝে ফিরিয়া যাইবার আর পথ নাই।'[৫৩]

দীর্ঘ ছ'বছরে শ্বশুরবাড়িতে সুনীতি শুধু ঘরের কাজকর্ম্মই করেছে, বহির্জগতে কী পরিবর্তন হচ্ছে বা হয়েছে তার কোন খোঁজখবরই সে রাখতে পারেনি কারণ সুনীতির স্বামী প্রাচীনপন্থী সেকেলে ধরণের লোক; স্ত্রীর সঙ্গে বহির্জগৎ নিয়ে কোন আলোচনাই সে করে না।

ভাই নির্ম্মল যে এবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে তার কাছ থেকেই সুনীতি আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে, দিন কাল সম্পর্কে অনেক তথ্য পায়। সুনীতি বলে — ''আচ্ছা মেয়েরা এই যে এত মেলামেশা করচে এতে তাদের জ্ঞানের প্রসার হয়তো বাড়ছে, কিন্তু তাদের মনের নির্জ্জনতা আর প্রশান্তি কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না? সে জিনিসটা তাদের কাছ থেকে পুরুষরা একান্তভাবে আশা করে।''[৫৪]

এ বিষয়ে নির্ম্মল ও একই মত পোষণ করে। সেও বলে যে পুরুষরা মেয়েদের কাছে স্নিগ্ধতা আর প্রান্তিই একান্তভাবে চায়। নির্ম্মল এও বলে যে — মেয়েদের স্বাধীনতা অপর একটি দিকও রয়েছে এবং তা হল দেশের কাজে তারাও নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাপের বাড়িতে নিজের সংসারের চাপ আর নেই, তাই অনেক রাত অবধি সুনীতি-সুধীরা গল্প করে। সেই গল্পের কেন্দ্রে কিন্তু অনেক সময়ই রয়েছে তাদের স্বামীরা।

রাতে একদিন হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হল। পশ্চিমের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে সুনীতি পূর্বের সেই চাঁপাগাছটি দেখতে পেল এখনও প্রচুর ফুল হয়, গঙ্গার ওপারের বালুচরও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এমন সময় শৈশব-কৈশোরের কত স্মৃতিই না মনে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু এসব ছাপিয়ে বারে বারে যা মনে হচ্ছে তা হল — ''.... সেই একটি পরিচিত গৃহে এতক্ষণ কি হইতেছে, চাকররা যথা সময়ে ঘর দুয়ার বন্ধ করিয়াছে কিনা...''[৫৫]

সংসারের চিরকালীন সত্যিটাই এই যে চেষ্টা করেও মেয়েরা গৃহের সকল দাবি থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের জন্য কয়েকদিনও নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না।

'সময় হয়েছে' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'সময় হয়েছে' গল্পটি 'পাঠশালা'য় ১৩৪৪ এর মাঘ-এ প্রকাশিত হয়েছি। গল্পে পাওয়া যায় নরেন এবং অজিতকে। নরেনের মাতা নেই, কাকীমার কাছে মানুষ, কাকীমার একমাত্র ছেলে অজিত।

নরেন তার কাকিমার মতোই কবিতা ভালোবাসে। কাবিকামর হাতে মানুস হয়েছে বলেই হয়তো সংসারের রূঢ় দুঃখপূর্ণ কদর্যরূপটা সম্পর্কে সে জানত না। আশ্চর্যের বিষয় কাকীমার নিজের সন্তান অজিত কিন্তু মোটেই তার মায়ের মত হয়নি। অজিত পড়াশোনায় যেমন ভালো, তেমনি চরম বাস্তবাবাদী। অজিত অত্যন্ত পরোপকারী। সে কখনোই আত্মভোলা-আত্মপরায়ণ নয়। সবদিকেই যেমন তার সজাগ দৃষ্ট তেমনি সকল লোকই প্রয়োজনে তার সাহায্য পায়। মাঘ মাসে একদিন হঠাৎ উত্তর বিহারে প্রবল ভূমিকম্পে বহু মানুষ আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। অজিত তার স্কাউটের দলের সকলকে নিয়ে দুর্গত পীড়িতদের যাথাসাধ্য সেবা করে বেড়াছে। কর্মবীর পরোপকারী অজিতকে এভাবে কাজ করতে দেখে নরেনের যেন ঘুম ভাঙ্গে। সেও অজিতের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মনের সকল দ্বিধা দূর করে সেও অজিতের দলে সামিল হতে চায়।

'গরমিল' — গল্পটি ১৩৪৫ এর বৈশাখ-এ 'পাঠশাল'য় প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীর সবখানেই 'গরমিল'। গল্পে দেখি সুশেকে। সুরেশের ছোটকাকা ফিজিক্সের প্রফেসর সে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। সে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে যাওয়ার আগে মা মনসার মানত করা কবচ পরতে ভোলেন না। জাপানীরা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা অহিংসার নীতি মানেন না। জগতের সর্বত্রই এই একই গরমিল চলছে। সুবিধাবাদী ভন্ড দেশপ্রেমিক বিশ্বম্ভরবাবুর মুখোশও তিনি অনাবৃত করেছেন সর্বসমক্ষে।

'লগন ব'য়ে যায়' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'লগন ব'য়ে যায়' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'লগন ব'য়ে যায়'। বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে বইটির প্রকাশ কাল যা পাওয়া যায় তা হল ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৭। গল্পে দেখা যায় অরুণিমার এনগেজমেন্ট উপলক্ষে তার বান্ধবীদের মধ্যে ভীষণ উচ্ছাস। অরুণিমা শিক্ষিতা, আধুনিকা। কোর্টশীপ করে তার বিবাহ হচ্ছে। রোমান্সে, ছন্দে, আবেগে অরুণিমা এবং তার সাথী ভেসে চলেছে। অরুণিমার বান্ধবী মাধুরী এবং কলেজের অন্যান্য বান্ধবী যেমন — ইলা, বেলা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সেই গল্পই করে। এই সব মেয়েদেরই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে অপর বান্ধবী শোভনা নন্দী। প্রেম-ভালোলাগা-ভালোবাসা প্রভৃতির গল্প শোভনার কাছে তেমন আমল পায় না কারণ শোভনার জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শেখা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই শোভনার জন্য তার বান্ধবীরা তাই আফসোস করে বলে —

> ''আহা বেচারা শোভনা, য়ুনিভার্সিটিতে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হয়েচে বটে কিন্তু
> জীবনের আর একটা দিকে পেয়েছে রসগোল্লা।''[৫৭]

বিয়ের আগে যে প্রেম ভালোবাসা-ভালোলাগা সর্বস্ব হয়ে দেখা দেয় অরুণিমা এবং তার যোগ্য সাথীর ক্ষেত্রে বিয়ের পর সেই প্রেমই খাদে নামতে নামতে নিঃশেষ হয়ে যায়। এখন অরুণিমা এবং তার স্বামীর একঘেয়ে জীবন যাপনে প্রেম পালাবার পথ পায় না। হাস্যরসের মোড়কে লেখিকা আশালতা দেখান মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রেম, বিবাহ প্রভৃতির ফাঁদে প'রে মেয়েরা যদি তাদের উৎকর্ষ নষ্ট করে দেয় তবে পরে গিয়ে আফেসোস করতে হয়।

'জানালা' - সচিত্র ভারত ৫ বর্ষ ঃ ১ সংখ্যায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ বৈশাখ জানালা গল্পটি প্রকাশ পায়

আশালতা সিংহের এই গল্পটিতে আমরা সিতেশবাবুকে দেখি যে কোলকাতায় দাদার বাড়িতে থেকে কলেজেপড়ে। সে তার বৌদির সঙ্গে মাঝে মাঝে বৌদির বান্ধবীদের বাড়িতে যায়, সেই সব বান্ধবীরা উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ ঘরের, তারা কলেজে পড়েছে, বাইরের দেশের খবরাখবর রাখে, নিজের মত স্বচ্ছন্দে অন্যের সামনে সজোরে বলতে দ্বিধাবোধ করে না। সৌন্দর্যবোধও তীক্ষ্ণ, গথিক স্থাপত্য নিয়ে তাই এরা আলোচনা, নিজের থাকার বাড়িকেও মনের মত করের সাজাতে ভালোবাসে — তাদের এই ভালোলাগা, মনের স্বাধীন ইচ্ছাগুলো অকপটে অন্যের সামনে বলতে - এরা দ্বিধা করে

না - যতই অন্য লোক সেটাকে বাড়াবাড়ি বলে ভাবুক। সিতেশের তার বৌদির বান্ধবীদের এই আলোচনা শুনে হাসিও পাচ্ছিল আবার তাদের এই আলোচনাকে অনেকের হাল্কা ও খেলো মনে হচ্ছিল। সিতেশের মনে হচ্ছিল তাদেরছোট গ্রামটিতে জানালার ছাদ এবং পর্দার প্রয়োজনীতা নিয়ে কখনো এত উত্তপ্ত আলোচনা সে শোনেনি। বৌদি এবং তার বান্ধবীরা এরপর যখন সিনেমা দেখার পরিকল্পনা করে তখন সীতেশ একা একা হেঁটে বাড়িফেরার জন্য বিদেয় নিতে চায়। বৌদি এবং তার বান্ধবীরাও সীতেশকে আর আটকায় না।

সীতেশ সোজা বাড়ির রাস্তা না ধরে একটু বেড়াবার জন্য অন্য পথে চলা শুরু করে। একটি গলির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটা জীর্ণ দোতালা বাড়ির দিকে তার চোখ যায়। সে দেখে — 'একতলার একটা ছোট ঘরে ঘুলঘুলির মত একটা জানালা। জানালার উপরের তাকটায় কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে। একটি মেয়ে ব্যাগ্র প্রত্যাশায় সেই ঘুলঘুলিটার কাছে দাঁড়াইয়া আঁচলে করিয়া নিজেকে বাতাস দিতেছে।'[৫৭]

সীতেশের মনে হল অসহ্য গরমে একটুখানি হাওয়ার প্রত্যাশায় ঐ মেয়েটির কাছে ছোট জানালাটি একটি মহামূল্যবান বস্তু। মেয়েটির প্রতি করুণায় সীতেশের মন ভরে ওঠে। তার মনে হয় এই নগণ্য জানালাটির মর্যাদার সীমা নাই। 'কোন ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডো তাহার এই মর্যাদাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইতে পারে না।'[৫৮]

মেয়েরা যখন স্বচ্ছন্দে থাকে, সৌন্দর্য চর্চা করে, বিদেশে ঘুরতে যাবার কথা বলে, নানান বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা নির্দ্বিধায় সে সম্বন্ধে মতামত জাহির করে তখন গল্পে পুরুষ প্রতিনিধিটির হাসি পায়, বাড়াবাড়ি বোধ হয় অসহ্য লাগে অথচ কোন গরিব ঘরের কর্মক্লান্ত গৃহবধূর প্রকৃতির সামান্য বাতাসটুকুও যখন ঠিকমত মেলে না তখন ঐ পুরুষটির গরিব বধূটির উপর করুণা হয়। মেয়েরা কি চিরকাল করুণার পাত্রী হয়েই জীবন নির্বাহ করবে? প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে — ভার্জিনিয়া উল্‌ফেরর একটি প্রশ্ন - 'মেয়েরা এত গরিব কেন?' শুধু এ প্রশ্নই নয় অক্সব্রিজের লাইব্রেরিতে বসে এলোমেলো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমনই এক ঝাঁক প্রশ্ন তাঁর মনে ভিড় করত।

বোঝাই যাচ্ছে এখানে গরিব শব্দটি বহুমাত্রিক তাৎপর্যবাহী, পৃথিবীর আদিতম শ্রেণিদ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত —এই দ্বন্দ্ব নারী এবং পুরুষের অবস্থানগত সংঘাত।

'জানালা' গল্পে আলো-বাতাস প্রত্যাশী গরীব গৃহবধূটিকে দেখে পুরুষ সতীশের মনে অনুকম্পা হয়, মমতায় ভরে ওঠে তার পুরুষ অহং বিপরীত দিকে বৌদির বান্ধবী ধনী ঘরের মেয়ে শিলার রুচি, পরিকল্পনা, সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে ইচ্ছা-আকাঙ্খার কথা শুনে সতীশের মনে হাফ ধরে যায়, এসব দেখতে শুনতে তার মোটেই ভালো লাগে না।

‘বেদনার বিভিন্নতা’ - সচিত্র ভারত, ৪ বর্ষ, ঃ ২২ সংখ্যা ২৩, ভাদ্র ১৩ ৪৬ সালে গল্পটি প্রকাশিত।

গল্পটিতে আশালতা দেখাতে চেয়েছেন সংসারের যাতাকলে অভাব অনটনে মেয়েদের শিল্পীসত্ত্বা কীভাবে সমূলে বিনষ্ট হয়।

গল্পটির শুরুতেই দেখি এক বর্ষণ মুখর দিনে ধনী পরিবারের গৃহবধূ শর্ম্মিলা পাঁচ পৃষ্ঠা ধরে তাতেই বান্ধবী উর্ম্মিলাকে চিঠি লিখেছে।

শর্ম্মিলা পরিবারে সাহিত্য চর্চা করার মতো যথেষ্ট সময় পায়। স্বামী দেবব্রতর সুন্দর চেহারা, পরনে তসরের পাঞ্জাবী, মিহি ধূতি সৌখীন মানুষটির কথা বার্তাতেও বেশ রুচির ছাপ। স্বামী-স্ত্রী উভয়েইঐ দিন বর্ষা প্রসঙ্গে শেলী, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, জয়দেবের কাব্য কীর্তির সমালোচনা করছিলেন। এই বর্ষা একদিকে যেমন শর্মিলা-দেবব্রতর মনে কাব্য সাহিত্যের ভাব জাগিয়ে তুলছে অন্যদিকে এই বর্ষাই এক গরিব ছাপোষা ঘরের দম্পতির জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সেই ছা পোষা ঘরের গৃহবধূটি অন্য কেউ নয় — শর্ম্মিলারই কলেজেরবান্ধবী উর্ম্মিলা। যাকে শর্ম্মিলা ইতিপূর্বে পাঁচ পাতা ধরে চিঠি লিখে বর্ষার অপরূপ রূপের বর্ণনা করছিল — ‘...এ পৃথিবীর সব কিছুই ভুলে যেতে হয়। ভুলে যেতে হয় খবরের কাগজ, ভুলে যেতে হয় রেডিও। ভুলে যেতে হয় বামপন্থীদক্ষিণপন্থীর বিরোধ। ....’[৫৯] (পৃ. ৯৪) শর্ম্মিলারা থাকে মধুপুরে। উর্ম্মিলা থাকে কোলকাতায়। উর্মিলার স্বামী উমাপদ চাকুরি করে, তবে আর্থিক অবস্থা যে তাদের মোটেই ভালো নয় সেটা বোঝা যায় তাদের বাড়ীঘরের অবস্থা দেখে। কোলকাতায় ‘গলির ধারে ছোট একতালা বাসা । ছাদ নেই। শয়ন কক্ষে, বারান্দাতে সর্ব্বত্র ভিজা কাপড় টাঙ্গানো।’[৬০] রান্নাঘরেও ভিজা ঘুটে, ভিজে কয়লা দিয়ে উনুন জ্বালানো যাচ্ছে না। অথচ উমাপদকে সময়মত অপিসে যেতে হবে। সাত-আট দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টির জন্য কাজের লোক আসে না। কাঠ কয়লা ভিজে থাকার দরুণ উনান জ্বলে না, ধোবা অর্ধেক জামা কাপড় নিয়ে নিরুদ্দেশ, হাট বাজার পর্যন্ত কাউকে দিয়ে করানো যায় না। অত্যন্ত কষ্টে শিষ্টে উর্ম্মিলা সংসার চালাচ্ছে। উমাপদ যখন তার স্ত্রী উর্ম্মিলাকে শর্ম্মিলার চিঠিটি দেয় তখন উর্ম্মিলার সেটা পড়বারও অবসর হয় না কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে রান্না শেষ করতে হবে, উমাপদ অফিসে যাবে।

একদিকে উর্ম্মিলার বাচ্চা মেয়েটিও কান্না জুড়েছে, তার জামা শুকায়নি। সমস্ত কাজ মোটামুটি সারা হলে উর্ম্মিলা শোয়ার ঘরে গিয়ে দেখে জানালাগুলো বন্ধ করতে মনে না থাকার জন্য বৃষ্টির ছাটে

খাটের উপরের বিছানা একদিকে সমস্ত ভিজে গেছে। উর্মিলা কেমন করে যে এই ভিজা বিছানা শুকাবে তা ভেবেই দিশে হারা হয়ে যায়। পাশের টেবিলে শর্মিলার চিঠিটা হাতে নিয়ে খানিকটা পড়তে পড়তে তার হাসি পাচ্ছিল। উর্ম্মিলার মনে হয় 'জীবনে বিভিন্ন পটভূমিকায় একই বর্ষার সুর কত বিভিন্ন ভাবেই না ধ্বনিত হইয়া উঠে।'[৬১]

অথচ শর্ম্মিলা এবং উর্ম্মিলা একই সঙ্গে একই শ্রেণিতে একই কলেজে পড়ত। সাহিত্য সংস্কৃতির রসোপলব্ধি করার ক্ষমতা উর্ম্মিলার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু অবস্থার হেরফেরে দুই বান্ধবীর দুরকম অবস্থা। এই উপলব্ধি উর্ম্মিলার — এই অভিজ্ঞতা স্বয়ং আশালতারও। আমাদের মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসু, তার স্ত্রী প্রতিভা বসুর সঙ্গে আশালতার পত্র মিতালি ছিল। প্রতিভার বিয়ে হয়েছিল সম রুচির বুদ্ধদেবের সঙ্গে যেখানে আশালতার বিয়ে হয় পাড়াগাঁয়ের রক্ষণশীলজমিদার বংশে। মনের মত পরিবেশে না থাকতে পারার জন্য মনোকষ্ট, আফসোস আশালতার চিরকালই ছিল।

'বাণীর নেশা' — সচিত্র ভারত, ৪ বর্ষ ঃ ২৬ সংখ্যা ২০ আশ্বিন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

গল্পে দেখি অমিত মুখোপাধ্যায়কে যিনি মাসিক পত্রের নামজাদা লেখক, এর উপরে ওনার আবার 'ভালো গভর্ণমেন্ট সার্ভিস আছে, পয়সার অভাব নাই'।[৬২] মেয়েদের স্বাধীন মতামত, একটু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য থাকাটাই তার পছন্দ। স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ হলে অযথা খিটখিট করাও অনুচিত বলেই তিনি মনে করেন। অমিতের অধিকাংশ বন্ধুই অবশ্য মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাপোষা মানুষ। কমলাকান্ত অমিতেব এমনই এক বন্ধু। কমলকান্ত কেরানী, বাড়িতে তার স্ত্রী সহ তিনটি মেয়ে এবং দুটি ছেলে। কমলাকান্ত যে টাকা রোজগার করে তাতে তার স্ত্রীর পক্ষে এত বড় সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কমলাকান্ত অমিতের বাড়ির বৈঠকখানার আড্ডায় অমিতের মতামত শোনার পর সে একটু বিশেষভাবে স্ত্রীর প্রতি দরদ অনুভব করে তার মনে হয় তার স্ত্রীর 'মুখখানি বড় শুষ্ক, বড় ম্লান।'[৬৩] (পৃ.৯৬) তাই কমলাকান্ত মনে মনে ঠিক করেন যে আজ থেকে তার স্ত্রীকে তিনি আর জ্ঞানত দুঃখ দেবেন না। রাত দশটায় বাড়ি ফিরে কমলাকান্তকে অবশ্য স্ত্রীর বাক্য বাণে জর্জরিত হতে হয়।

> '' ... মাগো-মা, হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল। দিবানিশি এই সংসারের পিছনে বাঁদীর মত খাটছি, তবু যদি কপালে এতটুকু সুখ-শান্তি জোটে। বাড়ীর কর্তা কোন দায়িত্ব নেবেন না। হেলতে দুলতে সাহিত্য করে বাড়ী ফিরলেন রাত দশটায়।...''[৬৪]

বোঝাই যায় কমলাকান্তের স্ত্রী সুলোচনার বাক্যবাণ সহজে বের হয়নি। সংসারের চাপে ক্লিষ্ট সুলোচনা

একেবারে নাজেহাল। নিত্য দিনের অভাব অনটন তার স্বভাবকে খিটখিটে করে তুলেছে। এ দোষ কার? এ দায় কার?

'পূর্ব্বাপর' — আশালতা সিংহের লেখা গল্পটি 'সচিত্র ভারত', ৪ বর্ষ ঃ ৩৪ সংখ্যা, ৭ পৌষ, ১৩৪৬-এ প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়িকা নমিতা চ্যাটার্জ্জি উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের স্মার্ট তরুণী, সে টেনিস খেলে, অবলীলায় ছেলেদের সঙ্গেবসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। সবকিছুতেই তার একটা স্বতস্ফুর্ত ভাব।

এই নমিতা চ্যাটার্জ্জীর একদিন টেনিস খেলার বিরতিতে 'তরুকুঞ্জের নিভৃত ছায়াচ্ছন্নতলে' সবুজ বেঞ্চে বসেপ্রেফেসর রজতের কথাবার্তায় মন ভিজে গেল। সেখানে আরও অনেক দিক্‌পাল ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। অরুণ প্রকাশের মত নামজাদা ব্যারিস্টার ছিলেন। অরুণপ্রকাশের মতে '... মেয়েদের একটা আলাদা জগৎ আছে, সেখান থেকে তাঁদের টেনে নামালে ফল ভালো হয় না।'[৬৫] — এ কথাপ্রসঙ্গে রজত তার প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন কথার ফুলঝুড়ি ছড়াতে দেরি করে না বিশেষত যখন দেখে নমিতা চ্যাটার্জ্জীর মতো স্মার্ট সুন্দরী মেয়ে মুগ্ধ নয়নে তার ঐ কথাগুলি হাঁ করে শুনছে।

''... অরুণপ্রকাশের মত প্রগতিশীল ব্যারিস্টার, নকুলপ্রসাদের মত টাকার কুমীর, পাংশু দে'র মত দিগ্‌গজ আর্টিস্ট'[৬৬] — এত সব পাণিপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নমিতা চ্যাটার্জ্জী শেষ পর্যন্ত প্রফেসর রজতকেই বিবাহ করল। বিয়ের পরের ঘটনা কিন্তু রজতের প্রগতিশীল মনোভাবের উল্টো চেহারাটাই আমাদের দেখাচ্ছে। যেখানে আমরা দেখি নমিতা তার খুকিকে বিকেলে গা মুছিয়ে টিপ পরিয়ে দোলনায় শুইয়ে অবসর মত বারান্দায় একটু দাঁড়াতেই কলেজ ফেরৎ রজত বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রী নমিতাকে দেখে তিরস্কার করে ওঠে '.... আবার ঐ রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েচ। ছেলের মা হয়েছে, বুড়ো হতে চললে এখনও ওসব বেহায়াপনার অভ্যেস গেলনা।....'[৬৭] বোঝাই যায় বিয়ের আগে রতজের নারী প্রগতি নিয়ে বড় বড় বুলি—কথার কথাই ছিল; সত্যিকারের মনের কথা নয়।

'সংকল্প' — গল্পটির প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না। গল্পের নায়ক পল্লীগ্রামের ছেলে, লেখাপড়ায় ভালো, বরাবর সমস্ত পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু চাকুরীর বাজার অত্যন্ত খারাপ। তাই কোলকাতায় একটা মেসে থাকে ছয় মাস ধরে চাকুরীর চেষ্টা করেও সে একটা চাকুরীও জোটাতে পারেনি। বাড়ির আর্থিক অবস্থা আগে ভালোই ছিল কিন্তু ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করতে গিয়ে জমি

জমাসহ মায়ের কিছু গহনাও চলে গেছে। এমন অবস্থায় পিতার মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। চাকুরী যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন গ্রামের যে দু-দশ বিঘা জমি আছে তাই চাষ আবাদ করে সংসার চালানো মনস্থ করে নায়ক। তার এই সংকল্পের কথা সে স্ত্রীকেও জানায়। স্ত্রী তার এই সংকল্পের কথা শুনে মনে মনে যথেষ্ট কষ্ট পান। মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসিকতায় চাকরীর গুরুত্ব যে কতখানি তা স্পষ্ট হয় স্ত্রীর মনোভাবে। শুধু স্ত্রী নয় গ্রামের আর পাঁচ জন মানুষও যখন শুনল এত শিক্ষিত হয়েও সে জমি জমা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা মনস্থ করেছে তখন তারাও হায় হায় করে উঠল। লোকের অবজ্ঞায় যখন অস্থির অবস্থা সেই সময়ে একটা মাস্টারির চাকুরীর নিয়োগপত্র এসে উপস্থিত হয়। গিন্নীর কাছে এ সংবাদ দেওয়া মাত্র সেও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ঠাকুরের কাছে মানতের টাকা উঠিয়ে রাখে। গ্রামের রায় মশায়ও এই উপলক্ষে একদিন গ্রামের লোকেদের ভোজ খাওয়ানোর প্রস্তাব রাখে। আর এই সব খুশির মাঝে জমি চাষাবাদ করে সংসার চালানোর সংকল্প চাপা পড়ে যায়।

'কাসুন্দি' — সচিত্র ভারত ৪ বর্ষ ঃ ৫ সংখ্যা ২৯ বৈশাখ ১৩৪৬ এ প্রকাশিত।

আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসের মোড়কে গল্পটি পরিবেশিত হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একচক্ষু একপেশে দেখাকে ব্যাঙ্গের তীব্র খোঁচায় খানিকটা আঘাত হানতে চেয়েছেন লেখিকা। আশালতার বক্তব্য গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্রের মুখে '....আজ মেয়েরা বিমান চালিকা হচ্ছে, ব্যারিস্টার হচ্ছে। সেনা নায়িকা হতেও বড় দেরী নেই। ... মেয়েরা যেমন আজ জগতকে সদার্প দেখিয়ে দিচ্চে যে, পুরুষদের কাজ সে তাদেরই সমকক্ষ হয়ে তেমনই সুচারু করে নির্ব্বাহ করতে পারে, পুরুষদেরও কী আজ দেখাবার সময় আসেনি যে, তারাও মেয়েদের কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে!'[৬৮] কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় 'রান্নাকে কম্পালসারি সাবজেক্ট' করতে হবে।

'এপিঠ-ওপিঠ' — গল্পটিরও প্রকাশকাল দেওয়া নেই।

মানুষের মনে একদিকে যেমন প্রেম, সৌন্দর্য, কল্পনার অনুভূতি থাকে অন্যদিকে তেমনই বাস্তব সংসারে অভাব অভিযোগ,ভাবনা-চিন্তা, পরনিন্দা-পরচর্চা এসবও থাকে, জীবনের দুটো দিকই সত্যি।

বিয়ের আগে সাংসারিক দায়িত্ব তেমন থাকে না, ভাবকল্পনায় বেশিরভাগ মানুষই এ সময় গা ভাসায়, এমনই ঘটেছে অক্ষয় এবং তার প্রগতিশীল যুবক বন্ধুদের ক্ষেত্রেও। অক্ষয় এবং তাঁর বন্ধুরা

অত্যন্ত মন দিয়ে সৌন্দর্য চর্চা করে। প্রথম দেখাতেই অক্ষয় শর্ম্মিমালা নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। এর পেছনে কারণ উল্লেখ করে অক্ষয় বলে —প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়া বিষয়টি প্রায় প্রতিটি মহাকাব্যেই ঘটেছে। যাইহোক বর্ষাস্নাত এক সকাল বেলায় প্রথম শর্ম্মিলাকে দেখে অক্ষয়ের মনে হয়েছে '.... ভোরবেলাকার শিশির ধোয়া একটি পদ্ম।...'[৬৯]

হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আসাতে হারু কবিরাজকে অক্ষয়দের বৈঠকখানা ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বসতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও অক্ষয় এবং তার বন্ধুদের প্রেম-সৌন্দর্য-শর্ম্মিলা প্রভৃতি কথা হারুবাবুর কানে আসে। অক্ষয়ের কথায় আরও জানা যায় এই শর্ম্মিলা হল ভবরঞ্জন ঘোষের মেয়ে। হারুবাবু বুঝতে পারে যে এ হচ্ছে তাদেরই পাশের বাড়ির ভবরঞ্জনের মেয়ে ক্ষেন্তি যার ভালো নাম শর্ম্মিলা। ক্ষেন্তি প্রায় হারু কবিরাজের স্ত্রীর কাছে এসে নানান রকম গল্প করে - বিনির দেমাকের প্রসঙ্গ যেমন সে গল্পে থাকে তেমনি থাকে ঠিকা ঝি-এর স্পর্ধা নিয়ে কথা। শর্ম্মিলার এদিকটা অবশ্য অক্ষয়ের নজরে পড়েনি। তবে আগে থেকেই সে বিনির জাত ধর্ম জেনে নিয়েছে। নইলে মনে মনে বেশিদূরে এগোন যেত না কারণ অক্ষয় তার বাবাকে ভালো রকমই চেনে।

'নব-যুগ' প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না

গল্পটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সবযুগেই সমানভাবে দেখা যায়। সেই বিখ্যাত ভোট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা। আদর্শবিলাসী ধনী পরিবারের অতীন্দ্রনাথ বন্ধু বান্ধব, সাহিত্য আলোচনা তর্ক বিতর্কেই বন্ধুদের সাথে মজে আছে। অতীন্দ্রের দিদিরও ধনী পরিবারেই বিয়ে হয়েছে। বালিগঞ্জে নিজস্ব বাড়ি থাকলেও পল্লীবাংলায় নিজস্ব জমিদারিও রয়েছে। তাদের জমিদারি যে জেলায় সেখানে অতীনের জামাইবাবু এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন তাই ললিতবাবুর শ্যালক অতীনও তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মোটরে করে গ্রামে যাবেন ভোটের প্রচারের জন্য। গ্রামের অজ্ঞলোকেদের ভোট প্রার্থী ললিতবাবুর মহিমা কীর্তন শোনাতে হবে। আর এই সুযোগে অতীনরাও পল্লী গ্রামের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে। বিরাট খাবার দাবারের আয়োজনও থাকবে-অনেকটাপিনিকের মত হবে। অতীন যদিও যাবে কিন্তু দেশের-দশের ভবিষ্যত যে ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হয় সেই ভোট নিয়ে এমন ছেলেখেলা, ঠাট্টার সুরে ললিতবাবুর হাল্কা কথাবার্তা অতীনের ঠিক পছন্দ হয় না।

হ্যান্ডবিল বিলি ক'রে ওজস্বী বক্তৃতা দিয়ে সমস্ত দেশটা চষে বেড়ালেও ললিতবাবু জানেন 'রসনার সরস পথে একমাত্র জয় করা যাবে ঐ সব চাষাভূষাদের'[৭০] কারণ ওরা সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার অর্থ কিছুই বোঝেনা।

অতীন্দ্র তাই যতই ভাবুক গ্রামের লোকেদের ভোটাধিকারের ফলে একটা ভাবী নবযুগের পূর্ব সূচনা হতে চলেছে ঐ চাষাভুসা লোকেরা কিন্তু আলোচনা করছে কোন দল কি কি খাবার তাদের খাওয়ালো এসব নিয়ে। লেখাপড়ার চর্চা তথা জ্ঞানের আলো যতদিন না গ্রামের ঐ লোকেদের মধ্যে জ্বেলে দেওয়া যাচ্ছে ততদিন তাদের ভাবনার গন্ডি খাবার-দাবারেই আবদ্ধ থাকবে - হাল্কা সুরে একথাই হয়তো লেখিকা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'কাব্যমণ্ডল' গল্পটিরও প্রকাশক, প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না।

দুই বোন ধীরা এবং নীরা। ধীরার স্বামী হরসুন্দর মার্চেন্ট অফিসের ক্লার্ক, ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয় এবং বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি অত্যন্ত হিসেবী হলেও স্ত্রীর প্রতিও যথেষ্ট যত্নবান এবং সৌখিনও। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে সিনেমায়ও যান। স্বামীর সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর হওয়ায় ধীরার সংসারে ধীরাকে তেমন কাজে কর্মে নজর রাখতে হয় না, সবই সুশৃঙ্খলভাবে ঘটে চলে।

আশাতীত আরামে থাকলেও তেমন কোন কাজ না থাকলে যা হয় ধীরার সেই অবস্থা হলো।

ধীরা ভাবল তার মেজদি নীরা না জানি কী সুখে আছে কারণ নীরার স্বামী কবিতা লেখেন, মাসিকপত্রে সেই কবিতা ছাপা হয়ে বের হয়; যদিও তিনি একজন পশারহীন উকিল। নীরা আবার ডাকযোগে ঐ মাসিক পত্রিকাগুলি বোন ধীরাকে পাঠিয়ে দেয় এবং স্বামীর রচিত কবিতার নিচে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে দেন।

বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন এবং হিসেবী স্বামীর বহু ত্রুটি এরপর প্রকট হয়ে ওঠে ধীরার সামনে যেমন ধীরা এতদিন পর আবিস্কার করল যে

> '...তাহার স্বামী ঘুমাইবার সময় নাক ডাকান, তেল মাখিবার সময় আট হাত কাপড় পরেন,হাসিবার সময় তাঁহার দাঁত বাহির হয় ...'[৭১] ইত্যাদি।

এই সমস্ত চোখে পড়ার ফলে বলাবাহুল্য ধীরার জীবনে একটি সূক্ষ্ম অশান্তির সূচনা হল। ধীরার স্বামী যখন ধীরার শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন তখন ধীরা জানায়

> '...পয়সা থাকলেই খরচ করা যায় কিন্তু তাতে শরীর সারে না। মেজদি কেমন একটা কাব্যমন্ডলে বাস করেন। ওকেই বলে যথার্থ জীবন। আর আমাদের শুধু জীবনের অভিনয়।'[৭২]

ধীরার স্বামী কী বুঝল এতে তা বোঝা না গেলেও তিনি তার স্ত্রীকে দিন পনেরো মেজ শ্যালিকার বাড়িতে রেখে আসা স্থির করে মেজ শ্যালিকার স্বামী অবনীশের কাছে চিঠি দিলেন। বোন আসবে দিদি যথারীতি খুশি এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। উদ্বিগ্ন হবার কারণ তাদের আর্থিক অসঙ্গতি।

মেজদির বাড়িতে আসার দুএকদিনের মধ্যে ধীরার কল্পনা বিলাস উবে গেল। ধীরা উপলব্ধি করল অভাব অনটনের সংসারে মেজদি এবং জামাইবাবু কীভাবে জেরবার হচ্ছেন। ধীরা অচিরেইবুঝতেপারে মেজদি কোনরকম কাব্যমন্ডলে বাস করেন না বরং ধীরাই অনেক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটায়। তাই দিন পনেরো পরে যখন ধীরা নিজের সংসারে ফিরে এল তখন তার মধ্যে আর কোন রকম হীনমন্যতা কিংবা শারীরিক অসুস্থতার কোন লক্ষ্মণ দেখা গেল না।

'স্বপ্ন দেখা' — গল্পটিরও প্রকাশক এবং প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না।

গল্পটির বিষয়বস্তু চিরন্তন বেকার সমস্যা। যদিও গল্পের শুরুতে আমরা দেখি বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, ঘরের ভেতরে বেশ কিছু পুরুষ তাদের নিজেদের মধ্যে আড্ডায় মশগুল। তাদের আলোচ্য বিষয়টিও বেশ উঁচু দরের তারা '...বার্ট্রান্ড রাসেলের মতবাদ, অল্ডাস হাক্সলির প্রতিপাদ্য এবং জহরলাল নেহেরুর সমাজনীতি...'[৭৩] (পৃ. ১১২) এইসব নিয়ে আলোচনা করে থাকে। এর সঙ্গে সিনেমা -রেডিও যে বাঙ্গালীকে কেমন অলস কর্মবিমুখ করে তুলেছে সেসবও আলোচনা চলে। বৃষ্টি ক্রমে খানিকটা ধরে এসেছে কিন্তু তর্ক আলোচনা আরও জমে উঠেছে। এমন সময় একটি মার্জিত চেহারার ফেরিওয়ালা বারান্দায় উঠেএসে বাবুদের কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করাতে আলোচনার রসভঙ্গ হয়। কিন্তু ছেলেটির ভদ্রস্থ চেহারা দেখে অনেকেই তার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠে তাকে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই কিছু তার কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিস কেনে।

ঐদিন রাতে কথক বোনের পীড়াপীড়িতে সিনেমা হলে যায় এবং সিনেমা শুরু হলে দেখে —

> '' সেই অতি কোমলরস সিক্ত একটা অবাস্তব জীবনের ছায়া — যেখানে ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কেবল প্রেমের দীর্ঘশ্বাস, চাঁদের আলো, দূরে চলার রাস্তা এবং করুণ গান আছে।''[৭৪]

— এমন সিনেমা দেখতে বিরক্ত লাগলেও হঠাৎ মাঝে ইন্টারভেলের সময় কথকের চোখে পড়ে যে 'চার আনার সীটে সেই সকাল বেলাকার ফিরিওয়ালা বসিয়া আছে।'[৭৫]

কথক উপলব্ধি করে — 'জীবনে যার আলো নাই, আশা নাই, স্বপ্ন নাই, আদর্শ নাই, সে অন্ততঃ চার আনা পয়সা খরচ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্ন দেখিতে পারে।'[৭৬]

উক্ত বক্তব্যের পরে আশালতা যা সরাসরি লেখেননি কিন্তু আমাদের যা ভাবিয়ে তোলে তা হল — মেয়েদের জীবনও কী ঐ ফেরিওয়ালার মত? নাকি আরও করুণ মেয়েদের অবস্থা? মেয়েরাও হয়তো স্বপ্ন দেখতে চায়। কিন্তু সবাই কি পারে? কারণ চার পয়সা খরচ করার ক্ষমতাও সবসময় সকল মেয়ের থাকে না।

'প্রশ্নপত্র' — গল্পটি অপূর্ব্ব কুমারের। যে 'পণ করিয়াছিল গান-বাজনা জানা রীতিমত বিদুষী মেয়ে যদি কখনো খুঁজিয়া পাতিয়া মিলে তবেই বিবাহ করিবার সম্মতি দিবে।'[৭৭]

অপূর্ব একটা চাকুরীও ইতিমধ্যে জোগাড় করে ফেলেছে। ফলে দেশে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা প্রায়ই অপূর্বের জন্য পাত্রীর খোঁজ নিয়ে আসে। অপূর্বও নিজেকে বিশাল দরের পাত্র ভেবে রোজই ভাবে যে, পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রীকে কিকি প্রশ্ন করবে।'প্রতিদিনই তাহার প্রশ্নপত্রের তালিকার পরিবর্দ্ধিত এবং পরিমার্জ্জিত সংস্করণ মনে মনে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে লাগিল।'[৭৮]

বাংলাদেশের কোন মেয়েই যখন মনঃপূত হল না তখন পশ্চিমের এক সহরের অপূর্ব কনে দেখতে এল। কনে দেখার মুহূর্তটি আশালতা বর্ণনা করেছেন এভাবে —

> 'সময়টা যাহাকে বলে সূর্য্যাস্তের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বের মুহূর্ত্তটুকু। বারান্দায় বেতের চেয়ারে অপূর্ব্ব বসিয়া আছে। সূর্য্যাস্তের রাঙ্গা আলো সম্মুখের গঙ্গাবক্ষে ও অনতিদূরের নীল বনানীর উপর ছড়াইয়া পরিয়াছে। বাগানে একটা পুষ্পিত চাঁপা গাছ ফুলে ফুলে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার যো হইয়াছে।'[৭৯]

আশালতা বহু গল্প উপন্যাসই এই সূর্যাস্ত, গঙ্গাবক্ষ, চাঁপা ফুলের গাছ — এসবের বর্ণনা আছে।

ভবনাথবাবুর মেয়ে শোভনার মধ্যে এমন কিছু অপূর্ব সেই সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় দেখেছিল যে নিজের পূর্বের তৈরী করা প্রশ্নপত্রের জন্য নিজের কাছে নিজেই সে হাস্যস্পদ হয়ে উঠেছিল। এরপর অপূর্বের বন্ধু অখিল যখন শোভনাকে নানা প্রশ্ন করা শুরু করে তখন অপূর্বই তাকে থামিয়ে দেয় এবং শোভনার মত ব্যক্তিত্বময়ী মেয়ের কাছে নিজের দম্ভের জন্য ক্ষমা চায়।

'স্বপ্নের অর্থ' — গল্পটি 'সচিত্র ভারত' ৩ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যায় ১৩৪৫-এ প্রকাশিতহয়।

প্রকাশচন্দ্র বসু নামক এক যুবক যে বেকার সমস্যার যুগেও একটি দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি জোগাড় করেছে এবং এখনও পর্যন্ত অবিবাহিত। বাংলাদেশের এমন পাত্র বন্ধুদের উসকানিতে আরও বেশি মূল্যবান মনে করে নিজেকে। কাজেই উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজে চারিদিকে চলে চিরুনি তল্লাসি মেলেও মনের মত পাত্রী। লেখকের কথায় — '...একেবারে নিখুঁত, অনবদ্য। নাচ, গান, বাঁশী, শানাই, পিয়ানো যত রকম ইনস্ট্রুমেন্ট আছ সব।'[৮০] প্রকাশ এবং তার বন্ধুগণ মিস সুজাতা সম্পর্কে মত দিলেন যে, '... কোন অপূর্ণতা নাই। ব্রতচারী নৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যান্ডোলিন, বেহালা এবং আধুনিকতম গানের আধুনিকতম সুর অবধি শ্রীমতী সুজতার জানা আছে।'[৮১]

আধুনিক পাঠক মনে করবেন এমন শিল্পরসিক, সমঝদার প্রকাশের সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুজাতার শিল্পীসত্তা তার প্রকাশে কিছু মাত্র বাধা তো পাবেই না বরং আরও প্রসারিত হবে।

কিন্তু বিয়ের আড়াই বছরর পরে যে দৃশ্য উঠে আসে তা কিন্তু মোটেই উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে না। দেড় বছরে একটি শিশু এবং সাতমাসের অপর একটি শিশুকে নিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজের ভারে সুজাতা রীতিমত কায়ক্লেশে দিন চালাচ্ছে। প্রকাশ হঠাৎ এসে স্ত্রীকে তার পাঁচজন বন্ধুর জন্য চা-গরম চপের অর্ডার দিয়ে বাইরের ঘরে মুন্সেফ ও বন্ধুদের নিয়ে বসে। চা-গরম চপ কাজের মেয়ের হাত দিয়ে সুজাতা বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। প্রকাশ আবার এসে তার স্ত্রীকে যখন বলে মুন্সেফ হিমাংশু বাবু ভারী জেদ ধরেছে — '... তোমার হাতের ম্যান্ডোলিন শুনবেই। প্রশংসা শুনেছে কিনা। থামিয়ে রাখা দায়।'[৮২] সুজাতা কিন্তু রাজি হয় না। ইতিমধ্যে তার ছোট খোকা ঘুম ভেঙ্গে কান্না জুড়েছে। কাজেই খোকার কান্না থামাতে ছুটতে হয় সেই সুজাতাকে। রান্নাঘর আর শোবার ঘর এই করতেই এখন সুজাতার দিন যায়। কোথায় গেল তার প্রতিভা আর কোথায় গেল তার শিল্পী সত্তা।

'বদলে' — এই গল্পেও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতার কন্যাকে সৎ পাত্রস্থ করার আগ্রহ এবং তার রূপায়ণে তৎপরতাই গল্পের বিষয়। আশালতার বহু গল্প-উপন্যাসের মতো এই গল্পেও দেখি পাত্রী রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী না হলে বঙ্গ যুবকদের যেন পাত্রী মনে ধরে না।

গল্পে মেয়েটির নাম রেখা; সদূর লক্ষ্ণৌ থেকে রেখার বাবা মা রেখাকে নিয়ে এসেছে কোলকাতায়, উদ্দেশ্য স্বজাতি-সৎ পাত্রে মেয়েকে বিবাহ দেওয়া। রেখার মামার বাড়ি পাড়াতেই তারা ভাড়া দিয়ে থাকছে। রেখার বাবা হরকান্তবাবু এ ব্যাপারে রেখার মামাদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছেন। রেখার মামা বরদাবাবু তার দিদি জামাইবাবুকে পরামর্শ দিলেন যে মেয়েকে কয়েকটা দিন খানিকটা ঘষে মেজে তৈরী করতে। মেয়ে যেন দুপাতা সংস্কৃত পড়তে পারে আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গানও বেশ কটা গাইতে পারে।

বরদাবাবুর আনা প্রথম সম্বন্ধটায় রেখাকে দেখে শুনে পাত্র পক্ষের তেমন পছন্দ হল না। দু'চারটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে পারলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে রেখার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত কারণ বাড়িতেও তাকে ঐ বিষয়ে তেমন জ্ঞানদান করা হয়নি। শেলীর কবিতা সম্বন্ধেও রেখা তেমন বিশদভাবে পাত্রপক্ষকে উত্তর করতে পারল না কাজেই এ ক্ষেত্রেও তার নম্বর খানিকটা কমল। গানেও তার 'আধুনিক বাংলা গানের নিজস্ব ঢং বজায় থাকছে না, সেঁইয়া মেঁইয়া হিন্দুস্থানী চাল এসে পড়েছে।'[৮৩] তাই সব মিলিয়ে রেখাকে পাত্রপক্ষ থার্ড ডিভিশন মার্কস দিল এবং সেই সুবাদে পণের অঙ্কটাও অনেকটা বেড়ে গেল। পিতা হরকান্তবাবু টাকার অঙ্ক শুনে পিছিয়ে গেলেন। বড় মামাবাবু বরদাকান্ত অনত্র সন্ধান চালালেন। এবারও ব্যবসায়ী পাত্রের খোঁজ আনলেন। পাত্রের বালীগঞ্জে নিজস্ব চারতলা বাড়িও রয়েছে। 'টাকার কুমীর'। এবারে তিনি রেখার জন্য ইংরেজী পড়ায় মিস ট্রিকিকে নিয়োগ করার পরামর্শ দিলেন। কারণ এই পাত্রপক্ষ বেশ ইংরেজী জান স্মার্ট এবং আভিজাত্যপূর্ণ মেয়ের খোঁজ করছে। হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে খানিকটা আভিজাত্য থাকার জন্য রেখাকে আলাদা করে আধুনিক গান শিখতে হবে না। শুধু সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীটা ভাল করে রপ্ত করতে হবে।

এতকিছু বদলাবদলি করা হচ্ছে, এক পাত্র যখন প্রায় অপছন্দ করল তখন অপর পাত্রের পছন্দ হওয়ার জন্য রেখা এবং তারপরিবার আবার কোমর বেঁধে লাগল এতে কিন্তু একবারও কেউ রেখার মতামত জানতে আগ্রহী হল না। কারণ 'কথায় বলে মেয়েমানুষের মন নয়তো যেন জল, যে পাত্তরে রাখবে তেমনই ধারা হবে।'[৮৪]

'বিয়ের পর' — গল্পটির প্রকাশও জানা যাচ্ছে না।

দুইবান্ধবী — বরুণা এবং অরুণা। বিয়ের আগে দুজনেরই নিজস্ব আদর্শবাদ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, সমস্ত বিষয়ে মতামত বেশ সুতীক্ষ্ণ ছিল। অরুণা অত্যন্ত স্বদেশীয়ানায় বিশ্বাসী,বরুণা আবার

ততোটা নয়। বরুণা মনে করত —

> '...ইংরেজ জাতটা জাতি হিসাবে কারও ঘৃণার পাত্র কোনদিন হতে পারে না —
> মনে করে দেখ ভাই সেক্সপীয়ারের নাটক, শেলির কবিতা, ...'[৮৫]

এরপর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। অরুণা এবং বরুণা দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন দুজদের দেখা হয়। দুজনেই দুজনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়। শুধু সেক্সপীয়ারের নাটক, শেলির কবিতা পড়ে যে দিন যাপন হয় না অভাবে পড়ে বরুণা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বিয়ের পরে সংসারে অভাবের তাড়না দুই বন্ধুর মতকে এক জায়গায় মিলিয়ে দেয়।

'পূর্ব্বরাগ' — গল্পটি উত্তরা পত্রিকায় ১৩৪৪সালের আষাঢ় সংখ্যায় বের হয়।

ইলা এবং পল্লব — দুজনের পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, কোর্ট-শিপ করে বিবাহ —প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী বন্ধু মহলে সুবিদিত ছিল। সকলেই মনে করতে এরা আদর্শ দম্পত্তি। 'এ সমস্তই শোনা কথা। সরলা এবং ইলা একই কলেজে পড়ত। সেই সুবাদে সরলা ইলার বন্ধু। সেই ইলা-পল্লবের বাড়িতে তাদের বিয়ের বহু বছর পর আজ সরলা সহ অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। সরলা একটু আগে চলে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে আড়াল থেকে ইলা এবং পল্লবের কথাবার্তা শোনে। ইলা এবং পল্লব খেয়াল করেনি সরলা এসেছে এবং তাদের কথা শুনতে পাবে। তখন পল্লব-ইলার মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল— কখনো বাগানের কোথায় কোন্ ফুলগাছ লাগানো হবে তাই নিয়ে আবার কখনো অতিথিদের চা নাকি ভালটিন খাওয়ানো হবে —এসব নিয়ে।পদে পদেই যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

ইলার সঙ্গে এরপর সরলার দেখা হলে ইলা তার স্বামী পল্লববাবুর সঙ্গে সরলার আলাপ করিয়ে দেয়; পল্লববাবু একটা দরকারী কাজে উঠে গেলে সরলা এবং ইলা খানিকক্ষণ নিজেরা বসেআলাপ করে। সেই স্বল্প আলাপ আলোচনাতেই উঠে আসে বিয়ের পরবর্তী কালের বাস্তব পরিস্থিতি। ইলা বলে ' ...কত আর বল্‌ব, রোজকার জীবনের এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রতিদিনই সংঘর্ষ .... আর।''[৮৬]

সরলা শোনে আর ভাবে'পরশুরামের ''কচি-সংসদের' কথা!'' প্রেম যখন আসে তখন কেউ লঙ্কারফোড়ন বা চিনির হিসাব না করলেও 'প্রেমের জোয়ারের জল যখন ভাঁটারটানে সরিয়া যায় তখন অবশেষে এই লঙ্কার ফোড়নএবং চিনির চামচের পার্থক্যগুলিই উত্তুঙ্গ পাথরের মত খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে।' [৮৭]

‘নীর ও ক্ষীর’ — এই গল্পে মণিকার স্বামী কোলকাতায় চাকুরী করে, মণিকারা তাই কোলকাতাতেই থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, কথাবার্তা-চালচলন সর্বত্রই একটা মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে। মণিকার শ্বশুর বাড়ি গ্রামে, ‘শ্বশুর ছোটখাটো জমিদার’ ছিলেন। মণিকারা কালেভদ্রে গ্রামের বাড়িতে যায় তাই দু চার দিনের জন্য গ্রামে তাদের ভালোই লাগে। গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে তাই মণিকা গর্ব সহকারে বন্ধুদের গ্রামের অপূর্ব সৌন্দর্য সে যা দু’একদিন থেকে দেখেছে এবং উপলব্ধি করেছে তা শোনায়। বন্ধুরাও হাঁ করে সেসব কথা শোনে এবং মণিকাকে পরামর্শ দেয় তার এই গ্রাম দেখার অভিজ্ঞতা সে যেন লিখে সকল সাহিত্য পিপাসু বাঙ্গালীকে জানায়। মণিকার স্বামী চাকরীর সাথে সামান্য লেখালেখিও করেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কাজেই সেই সূত্রে তার কোলকাতার বাড়িতে সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবের আগমন ঘটে। তারাও এসব শুনে পল্লী গ্রামে যাবার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মণিকার স্বামী পর্দা প্রথা তেমন মানেন না এবং আধুনিক পন্থী। আর তাই চা পরিবেশন করারসময়মণিকাও সকলের সামনেই বের হন বেং তাদের আলাপ আলাচনাতেও অংশগ্রহণ করে। ‘চাঁপাকলি’ পত্রিকার ভূধর বাবুর ইচ্ছা এবারকার সাহিত্য সম্মেলন গ্রামে হোক। মণিকা একথা শুনে উৎসাহভরে প্রস্তাব দেয় তার শশুর-বাড়িতেই হতে পারে কারণ তার শ্বশুর-বাড়িতো গ্রামে। তাদের বিশাল গ্রামের বাড়িতে কারোরই থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হবে না। ঠিক হয় ফেব্রুয়ারী মাসেই তাদের গ্রামের বাড়িতে সাহিত্য সম্মেলন হবে।

মণিকার স্বামী রমেশবাবু এবং মণিকা সম্মেলন হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের আগেই গ্রামে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থাঠিকঠাক করার জন্য প্রস্তুত হন। অতিথিদের থাকার জন্য দীঘির ধারে ছোট্ট ছোট্ট কুটীর নির্মাণ করান, তাদের খাবার দাবারের আগে থেকে বন্দোবস্ত করা, স্টেশন থেকে গ্রামে পৌঁছানোর জন্য মোটর গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখা - এসমস্ত কাজই অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক তারা সম্পন্ন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এমন সব যখন ঠিক, যেদিন কোলকাতা থেকে সকলে গ্রামে এসে পৌঁছানোর কথা, সেদিন সকালবেলায় মণিকা আলপনা আঁকতে বসেছে হঠাৎ শশী বাগদির বউ জমিদার বাড়িরর উঠোনের মাঝে এসে চিৎকার করে কান্না শুরু করে, একদিকে তার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, তার স্বামী শশী তাকে মেরেছে নেশা করে, ‘শশীর বউ জমিদার বাড়ীতে বিচারের জন্য আসিয়াছে।’[৮৮] মণিকা এতে রীতিমত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সেই সঙ্গে বিরক্তও, কারণ অতিথিদের সামনে এ ধরণের কান্ড মোটেই প্রত্যাশিত নয়। সে তাড়াতাড়ি শশীর বউকে একটি টাকা দিয়ে পরে আসতে বলে দেয়। শশীর স্ত্রী চলে গেলে মণিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কারণ এখন সে পরিকল্পনা মাফিক অতিথি বরণ করবে, অতিথিরা

গ্রামের মনোরম সৌন্দর্যময় দৃশ্যে দেখে অভিভূত হবে। গ্রামের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, কুসংস্কার-অশিক্ষা— এসব কুৎসিত রূপ মণিকারা যেমন নিজেরাও দেখতে বুঝতে চায় না তেমনি অতিথিদেরও ঐ দিকটা দেখাতে বোঝাতে চায় না। তারা পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভরা 'ক্ষীর' টুকুই চায়, 'নীর' টা নয়।

পল্লীগ্রাম পল্লীগ্রাম করে মানুষ যে আদিখ্যেতা করে অথচ পল্লীগ্রামের কুসংস্কার অশিক্ষাপূর্ণ আসল চেহারাটা দেখলে মানুষ যে আর পল্লীগ্রামে থাকতে চাইবে না। সেকথাই লেখিকা গল্পটির মধ্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন।

'ত্যাগ' — প্রবাসী ১৩৪৪ চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়।

বিজয়নাথ এবং মন্দা স্বামী-স্ত্রী, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। মন্দার নন্দাই নরেশবাবু। নরেশবাবু তার এক দূরসম্পর্কের খুড়তুতো ভাইবউকে নিয়ে ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন। ট্রেন লেট থাকায়তারা মন্দাদের ওখানে আসে। নরেশের মুখেই মন্দা শোনে সুহাস বৌঠানের স্বামী প্রকাশ দিন সাতেক হল পরলোক গমন করেছেন, তার যক্ষ্মা হয়েছিল। অত্যন্ত দারিদ্র্যের সংসারে অসম্ভব খাটুনি খেটেও সে বাঁচাতে এবং শেষ রক্ষা করতে পারল না। এই দারিদ্র্যের মূলে যে অতি সত্তর বিবাহ করানো এবং দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া - একথা মন্দা যখন বলে তখন নরেশ বলে যে একথা বাংলাদেশের মায়েরা বুঝতে চায় না।

মন্দার স্বামীর বন্ধুরা যখন আড্ডা মারে, তর্ক করে বাঙ্গালীর চরিত্র নিয়ে তখন তারা বাস্তব পরিস্থিতির কথা ভুলে যায়। অধিক সন্তান দারিদ্র্যের লক্ষণ বহুল প্রচলিত; সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া, রোজগার ভালো করে করার আগেই সাংসারিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া - এ সবই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী সেকথা আমরা ভেবে দেখি না। লেখক এ দিকটাতেও তাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'রূপান্তর' — গল্পটি প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬-এ প্রকাশিত হয়।

গল্পের প্রেক্ষাপট পল্লীগ্রাম। যদিও সুনীতি এবং তার প্রফেসর স্বামী শহরে থাকে (সম্ভবত কোলকাতায়)। জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি প্রফেসর ছেলেদের পল্লীগ্রামে গিয়ে গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। প্রফেসরের নিজের দেশের বাড়িও বীরভূমের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। তাই সুনীতিরা প্রায় সব ছুটিতেই সদলবলে পল্লীগ্রামে চলে আসে।

এমনই এক গ্রীষ্মের বন্ধে সুনীতিরা গ্রামের বাড়িতে আসে, সঙ্গে প্রফেসরের কয়েকজন ছাত্রও আসে,উদ্দেশ্যে গ্রাম সংস্কার। সেইসময় সুনীতা গ্রামের রায়েদের বাড়ির মেয়ে সুনীলাকে দেখে । মেয়েটি মামাবাড়িতে থাকে, নিরীহ সুশ্রী মেয়েটির বয়স পনেরো বছর। ...'সর্ব্বাঙ্গে একটা অযত্ন অবহেলার ছাপ'[৮৯] । এই সুনীলাকে পাত্রপক্ষ পছন্দকরেনি। আর তাতেই মেয়েটি অত্যন্ত লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। লেখিকার মনে হয়েছে ''অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী। .... পথে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, বিবাহ হওয়াটাই কি স্ত্রী জাতির চরম ও পরম পরিণতি?''[৯০]

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই কথাটি বলেই লেখিকা আবার সমাজ-পরিবেশের কথা চিন্তা করে বিবাহের সার্থকতা নিয়ে লিখেছেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা গ্রামটি দলাদলি - পরনিন্দা-পরচর্চা-কুসংস্কারের আখড়া। মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন — পোস্টঅফিস, রেলওয়ে স্টেশন, দোকান পসরা এসবও কিছুই নেই গ্রামটিতে।

গ্রামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ লেখিকা জানাচ্ছেন ''.... সপ্তাহে একবার করিয়া হাট বসে। যে হাটে লাউ-বেগুন পাওয়া যায়, আর কিছু মেলে না।''[৯১]

এরপর সুনীলা নামের অল্পবয়সী মেয়েটি ফেরিওয়ালার সঙ্গে যেভাবে ঝগড়া-ঝামেলা করে তাতেও মনে হয় এমন কর্কশ ও কদর্যভাষায় নির্লজ্জের মতো ভাষা কিভাবে একটি অল্প বয়সী মেয়ে প্রয়োগ করতে পারে। এই সুনীলার সুনীতির মধ্যস্থতায় প্রফেসরের এক ছাত্র ধনী সন্তান বিনয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। গ্রাম সংস্কার করতে এসে গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করে বিনয়। এরপর বেশ কয়েকবছর কেটে যায় হঠাৎ একদিন সুনীতির সঙ্গে সন্তান সহ সুনীলা-বিনয়ের দেখা হয় তখন কিন্তু সুনীলার আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে। সুখ সমৃদ্ধিতে টলমল করছে সে। তার কথাবার্তাও অত্যন্ত রুচিকর বোধ হয় সুনীতার। পরিবেশ পরিস্থিতি কীভাবে মানুষের মন মানসকিতার পরিবর্তন ঘটায় গল্পটির মধ্য দিয়ে সেটাই লেখিকা আশালতা সিংহ তুলে ধরেছেন।

'মধুচন্দ্রিকা' —— প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৪-এ প্রকাশিত হয় গল্পটি।

গল্পের নায়িকা সুনন্দা - 'নব্য শিক্ষায় এবং নব যুগের আলোতে সে ছোট হইতে মানুষ হইয়াছে।'[৯২] পাশ্চাত্যের আলোয় আলোকিত তার মন। ইউরোপে যেমন বিয়ের পরই নবদম্পতি একান্নবর্তী বাড়িতে

মা-বাবার সঙ্গে না থেকে নিজেরা স্বাধীনভাবে থাকে - তেমনই স্বাধীনভাবে থাকার কথা ভাবে সুনন্দা।

(সুনন্দা চরিত্রটি আশালতার নিজের আদলে গড়া বলেই পাঠকের মনে হবে)

সুনন্দা শোনে যার সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়েছে সেই শচীকান্ত ল'পড়ছে, এখনও সে ছাত্র, নিজে উপার্জ্জন করা শুরু করেনি। তাদের একান্তবর্তী বড় পরিবার। সকলে মিলে গ্রামের প্রকাণ্ডজমিদার বাড়িতে থাকে। পিতা জমিদার, সেই জমিদার বাড়ির বউ হতে চলেছে আধুনিক মানসিকতার সুনন্দা। শ্বশুর বাড়ির সেকেলে ধরণের কথা শুনে সুনন্দার মনটি বেঁকে দাঁড়ায়। কিন্তু বাবা-মায়ের অনুরোধে সে বিয়েতে রাজি হয়।

বেথুন কলেজের আই-এ অবধি পড়া সুনন্দার বন্ধুরাও তার এমন সেকেলে পরিবারে বিবাহ হতে চলেছে জেনে যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করে।

সেই সুনন্দা বিয়ের পরে গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখে বিশাল একান্নবর্তী বড় বাড়ি। পদে পদে বাঁধা আবার সেই বাঁধা অতিক্রম করে রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীর কাছে আসা সবটাই যেন একটা ছন্দে বাধা জীবন। বিয়ের আগে সুনন্দা যতটা দুশ্চিন্তা করছিল বিয়ের পরে কিন্তু তারত ততোটা খারাপ লাগল না। এরপর সুনন্দার স্বামী অসুস্থ হলে ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বাদলাতে তারা যখন দুজনে একা একা অজানা নতুন পরিবেশে গিয়ে কিছুদিন থাকতে শুরু করল তখন বেশ কিছুদিন মধুময় প্রেম পর্ব চললেও দিন পনেরো পর তারা বুঝতে পারল সাংসারিক চাপে কীভাবে জেরবার হতেহচ্ছে তাদের দুজনকে কারণ এতদিন অভিভাবকদের ছত্রছায়ায় সংসারের কোন উত্তাপই তারা অনুভব করেনি। অতএব নবদম্পতি আবার একান্তবর্তী পরিবারের বাঁধাধরা ছন্দোবদ্ধ জীবনেই ফিরে আসে।

'বিরহ ও মিলন' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা এই গল্পটি অগ্রহায়ণ ১৩৪৫-এর মাসিক বসুমতী সংখ্যায় বের হয়েছিল। গল্পের নায়িকা সুনন্দা। পূজার ছুটিতে সে বাপের বাড়িতে এসেছে। স্বামী প্রকাশের যথেষ্ট কাজের চাপ,। তাই সুনন্দার সঙ্গে প্রকাশ সুনন্দার বাপের বাড়িতে থাকতে পারেনি। পিতৃগৃহে এসে আনন্দের মধ্যেও স্বামীর জন্য তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। স্বামীর বিরহে কোনো আনন্দানুষ্ঠানেই সে মন থেকে যোগ দিতে পারছে না। শেষে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দাদার সঙ্গে সে তার স্বামী গৃহে ফিরে আসে। স্বামী গৃহে ফিরে সুনন্দা দেখে সবই প্রায় অগোছালো, চাকরেরাও দস্তুর মত ফাঁকি দিয়েছে। সারাদিন খাটুনির পর স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি বসলেও কোনো প্রণয় সম্ভাষণ হয় না। স্বামী প্রকাশকে দৈনন্দিন কাজের কথা বললে সেও বিরক্তি প্রকাশ করে।

বাপের বাড়িতে আনন্দ না করে স্ত্রী যে ছুটে এসেছে স্বামীর জন্য স্বামীর কথা ভেবেই — এটা

বুঝতে পারলেও স্ত্রীর প্রতি স্বামীরও যে কর্তব্য-ভালোবাসা এবং যথাসাধ্যও তা দেখানো উচিত-সেই বোধ অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষেরই নেই। যেমন নেই এই গল্পের নায়ক প্রকাশের। স্বামী তার স্ত্রীর যে ভালোবাসা, সেবা পায়, তা যেন চিরকাল তাদের অধিকার এবং অধিকারের জোরেই সেটা তারা পায়। অথচ তা কিন্তু নয়। কর্তব্য এবং অধিকারবোধ স্বামী-স্ত্রী দুপক্ষেরই রয়েছে। স্বামীরও যে কিছু কর্তব্য আছে সে বোধই তাদের নেই। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেভাবেই মানুষকে ভাবতে শেখায়।

'বুদ্‌বুদ' — শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৪-এ প্রকাশিত।

বাড়ির কর্তা প্রণব ব্যানার্জি - পেশায় ব্যারিস্টার, বাড়ির গৃহিনী মীরা দেবী - ইনি নারী সমিতির সদস্যা, প্রায়ই জরুরী মিটিং থাকে কোন শ্রমিক উন্নয়ন, বাধ্যতামূলক শ্রীশিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি। নারী সমিতি - মিটিং এসব করে মীরা সংসারে রান্না করা, তথা সাংসারিক কাজকর্মে সময় তেমন দিতে পারেন না। নতুন রান্নার লোক কালীমোহন - রান্না তেমন ভালো করতে পারছে না ফলে খেতে বসে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হচ্ছে যেটা কালীমোহনের উপর যত না তার চেয়ে অনেক বেশি নিজের স্ত্রী মীরা দেবীর ওপর। কারন 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। রমণী রত্নটিরই কোন খেয়াল নেই কর্তা কী করে ভালমন্দ খাবে তার দিকে।

এদিকে মীরা দেবীর বান্ধবী সুহাসিনী দেবী তার পর্দানশিন শ্বশুরবাড়ি থেকে হঠাৎ একদিন মীরার কাছে দুদন্ডের জন্য দেখা করতে এসে দেখে —মীরা দেবীনবনিযুক্ত রান্নার লোককে তার রান্নার খারাপ হওয়ার জন্য রীতিমত হুমকি দিচ্ছেন।

সুহাসিনী যখন বলেন আজ তার শ্বশুরবাড়ি লোকজন কালীঘাটে পূজো দিতে গেছে সেই অবসরে তিনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারলেন নইলে এই কাজের সময়ে আসা সম্ভবত হত না। তখন একথা শুনে মীরা দেবী বলেন এত বাদ্যবাধকতার মধ্যে, এত পরাধীনতভাবে শ্বশুরবাড়িতে সুহাসিনীর মত তিনি থাকতে পারতেন না।

এখানে মীরা দেবী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক চেনা ছককে ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ভোগের ইচ্ছা, নারীর স্বেচ্ছাচার ও আকাঙ্খা নতুন করে খানিকটা হলেও উন্মোচনের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন লেখিকা। যদিও মীরা দেবীর কার্যকলাপের জন্য আপাতভাবে পাঠক হয়তো তাকে ধিক্কারই দেবে তবে '.... মেয়েমানুষের কি একটা স্বাধীন আত্মা নেই নাকি?'[৯৩] গল্পটির মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নটিও পাঠকের মনে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেন লেখিকা আশালতা সিংহ।

‘চিরন্তন ভ্রান্তি’ — শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৪৫-এ প্রকাশিত

চপলার পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে এখনও সন্তান হয়নি, সে স্বামীর সঙ্গে সাওতালপরগণার দিকে থাকে। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকে না, ফলে চপলার স্বাধীন জীবন যাপন। একটা সন্তানের আকাঙক্ষা বহুদিনের, সেই সন্তান যখন এল তখন চপলা একটু অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে বিভিন্ন শিশুবিষয়ক বইপত্র পড়ে চারদিক থেকে সন্তানকে আগলে মানুষ করার চেষ্টায় ব্রতী হল।

কিন্তু অতিরিক্ত নিয়মের বন্ধনে শিশুপ্রাণ যে হাফিয়ে ওঠে - এই সহজ সত্যটা কিছুতেই চপলার বোধগম্য হয় না।

এটা আসলে এক মায়ের মনস্তত্ত্বের গল্প। আধুনিক মানসিকতার একেবারেই ছোট পরিবারে বহু বছরের কাঙিক্ষত সন্তানকে ঘিরে মায়ের অতি-সচেতনতা, অতিমাত্রায় যত্ন-আত্তি, মায়ের ভয়-ভাবনা-ভালোবাসা খানিকটা হাসির মোড়কে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন লেখিকা।

তবে শুধুমাত্র হাস্যরসই নয় চপলারা যখন একটু বড় শহরে এসে বসবাস শুরু করল যেখানে আশেপাশের প্রতিবেশীদের একটি মেয়ে চাঁপার সঙ্গে চপলার মেয়ের খুব ভাব হয়ে যায়। চাপা মেয়েটি ভাল করে বয়সের তুলনায় বেশি পাকা। তবে এই পাকামি যতটা না তার স্বভাবগত তার চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশগত। কারণ শিশু যে পরিবেশে থাকবে, যে সব মানুষদের কথাবার্তা শুনবে - সে সবই সে অনুকরণ করার চেষ্টা করবে। এই ঘটনাই ঐ চাঁপা বলে মেয়েটির সঙ্গে ঘটেছে। ছোট থেকে সে শুধু শাশুড়ির ছেলের বৌএর উপর অত্যাচার, পরনিন্দা পরচর্চা, মেয়ে মানুষের কীভাবে শ্বশুরবাড়িতে বলা উচিত - এসব কথা শুনে শুনেই বড় হয়েছে। তাই পুতুলের খেলাতেও সে মেয়ে জামাই শ্বশুরবাড়ি এসব মিছিমিছি ঘরকন্না সাজায় এবং সংসারে মেয়েদের ওপর যে ধরণের অত্যাচার হয়ে থাকে সে সবই অভিনয় করে। চাপার সঙ্গে এসব খেলায় খুকীও যোগ দেয় এবং যারপরনাই আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু খুকীর মুখে পুতুল খেলার এসব প্রসঙ্গ শুনে খুকীর মা চপলা দেবী অনতিবিলম্বে ভাড়া বাড়ি তথা ঐ পরিবেশ থেকে বাস তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়টিকে অবশ্য চপলাদেবীর স্বামী হরকুমার বাবু হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হরকুমার বাবুর কাছে বিষয়গুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

'কনে দেখা' —প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৪-এ প্রকাশিত

লীলার স্বামীর বদলির চাকুরী,বড় বড় শহরে বদলি হন, সঙ্গে লীলাও সেইসব স্থলে গৃহস্থালী পাতে। শ্বশুরবাড়ি গ্রামে থাকলেও যেখানে লীলাদের খুবই কম যাওয়া হয়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে স্বামীসহ এসে প্রথম কয়েকদিন গ্রাম্য প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করে লীলার সেখানে আরও কিছুদিন থাকার সখ জাগে। আর লীলাও '..গাঁয়েএই পচা শ্যাওলাধরা পুকুর এই দলাদলির হিংস্র আবহাওয়ায় তাহাকে মানায় না'[৯৪] — এ বিষয়টি প্রথমেই উপলব্ধি করতে পারেনি।

লীলার শ্বশুরবাড়ি একান্নবর্তী বড় পরিবার। সকালে চায়ের পর্ব মিটলে মেয়ে বৌরা তরকারী কুটতে বসেছেন এবং লেখকের কথায় 'তরকারি কুটিতে বসিয়া মেয়েদের আলোচনা যেমন জমে এমনটি আর কিছুতেই জমে না।'[৯৫] নানা কথা উঠতে উঠতে বিমলা নামের একটি মেয়ের প্রসঙ্গ ওঠে যার বিয়ের বয়স গ্রামের অনেকের মতে পার হতে চলেছে অথচ বিমলার মা যোগ্য পাত্র পাচ্ছেন না বলে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন না। বিমলার মায়ের এ ধরণের চিন্তা ধারা বলা বাহুল্য গ্রামের অনেকের চোখেই বাড়াবাড়ি বলে ঠেকেছে। যদিও পাড়া গাঁ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লীলা একথা শুনে বলে ফেলে - '... কিন্তু খুড়ীমা, যেখানে সেখানে মেয়েকে বিয়ে দিলে তারপর সার জীবনই ত কষ্ট। তার চেয়ে যদি ভাল পাত্র খুঁজতে একটু দেরিই হয়ে যায় ক্ষতি কি?'[৯৬]

বলা বাহুল্য খুড়ীমার এধরণের কথা মোটেই পছন্দ হয়নি কিন্তু লীলার স্বামী নেহাতই উঁচু পদে চাকুরী করে তাই লীলাকে তিনি মুখের ওপর কড়া কথা শোনাতে পারলেন না।

লীলা কিছুদিন গ্রামে থাকার দরুণ একদিন হঠাৎ গ্রামের রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আরতি দেখতে এসে বিমলার মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। লীলাকে যে বলে যদি লীলা অবসর মত তার জানা কিছু সেলাই বিমলাকে শিখিয়ে দেয়। লীলাও রাজি হয়। বিমলা প্রায় দুপুরেই লীলার কাছে যায়, সেলাই শেখে, একটু আধটু গল্পও হয়। দু-চারদিনেই লীলার সঙ্গে বিমলার বেশ ভাব জমে ওঠে।

একদিন বিমলাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে বিমলার মায়ের সঙ্গে লীলার বেশ খানিকক্ষণ আলাপ হয়। বিমলার মায়ের কথাবার্তা ধ্যান ধারণায় লীলা মুগ্ধ য়। নানান গল্পের পরে 'লেখপড়ারর প্রসঙ্গ ওঠায় বিমলার মা বলেন —

> '' দেখুন, ছেলেমেয়ের সুখ দুঃখ সে তো তাদের ভাগ্য।... কিন্তু ছেলেমেয়েকে একটা বস্তু মা-বাবা দান ক'রে যেতে পারেন - সেটা শিক্ষা। জীবনে যেমনভাবে যে অবস্থাতেই থাক, যথার্থ শিক্ষিত হ'লে, অসুন্দরতাকে সে প্রাণপণে পরিহার ক'রে চলবেই।''[৯৭]

এরমধ্যে একদিন শোনা গেল বিমলাকে দেখতে পাত্র পক্ষ আসবে। 'পাত্রটি মাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়েছে। গাঁয়ে জমীজমা আছে।'[৯৮] পাত্রী পছন্দ হলে এক হাজার টাকা পণ, গয়না গঁয়না-গাটি, বিয়ের খরচ - সবই দিতে হবে।

পাত্রটি তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রী দেখতে এসেছে। বন্ধুটি নানান প্রশ্ন করে - কত ধরণের সেলাই জানা আছে? মুড়ি ভাজা থেকে মাছের কোপ্তা বানানো - রাধা বাড়া বাটনা-বাটা আবার গানও জানে কিনা হার্টোনিয়াম নাকি এস্রাজ বাজিয়ে? ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এত সব প্রশ্নের একটি সুন্দর এবং যথাযথ উত্তরই বিমলা দেয়, তা হল — 'সাধারণ অল্প আয়ের অধিকাংশ বাঙালী গৃহস্থঘরে চালাতে গেলে যা যা শিখতে হয় সেই টুকু মাত্র'[৯৯] সে শিখেছে। পাত্রের বন্ধুটি এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হলেও পাত্রের পছন্দ হয়েছে।

বিমলার এমন অর্ধ্ব স্বচ্ছল পরিবারে বিবাহ হবে ভেবে লীলার মনটা একটু খুঁত খুঁত করছিল কিন্তু বিমলাই সান্তবনা দিয়ে বলে শুধু সে কেন অধিকাংশ গরীব বাঙালী ঘরের মেয়েরই এমনিভাবেই জীবন কাটে শুধু মাত্র হাসি পায় কনে দেখেতে এসে পাত্র পক্ষের প্রশ্ন শুনে, বিমলার কথায় - 'মেয়েটিকে যাচাই করতে এসেজহুরি এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করবেন, তুমি শেলী, কীটস্, বয়রণ পড়েছ? ... তুমি ঘুঁটে দিতে পার?'[১০০] এ প্রশ্ন করতে লজ্জাও করে না কিংবা হাসিও পায় না প্রশ্নকর্তার।

'বাঁশীর সুর' — প্রবাসী পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় ১৩৪১ সালে প্রকাশিত হয় আশালতার এই গল্পটি।

অভাবের সংসার। স্বামী-স্ত্রী-মেয়ে এবং একটি ছোট ছেলে। মেয়ের ছ-সাত বছর বয়েস। মেয়েটির নাম মীরা। গল্পকার মীরার মা, মীরার বাবা এভাবে চরিত্রদের পরিচয় দেয়। বোঝা যায় - মীরাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। অসম্ভব অভাবে চারিদিকে হাহাকার অবস্থা। মীরার বাবা জুনিয়র উকিল হিসাবে বড় উকিল হিসাবে বড় উকিল বড় মাথাওয়ালা ধনধনিয়া তাকে শুধু লেজে খেলায়, ধনধনিয়া শুধু নয় ধনধনিয়ার স্ত্রীকে পান দোক্তা কিনে দিয়ে খুশি করতেও মীরার বাবা কসুর করে না কিন্তু ধনধনিয়া তাকে কোন কেসই দেয় না।

মনমেজাজ যখন না পাওয়ার হতাশায় ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ সে সময় মীরারবাবা পাওনাদার মুসলমান জরদাওয়ালাকে দেওয়ার জন্য টাকা চায় স্ত্রীর কাছে, কারণ আঠারোটি টাকা রাখা ছিল তার মধ্যে দুটি টাকা বুড়োকে দিলে বাকি ষোলটাকায় সংসার চলে যাবে কিন্তু যখন মীরার বাবা শোনে যে মীরার মা মীরার জুতোর জন্য দুটি টাকা খরচ করে ফেলেছে একথা শুরু মীরার বাবা আর নিজেকে সামলাতে

পাবে না রোগা মেয়েকে এর জন্য মারধর করে। মীরার মা স্মম্ভিত হয়ে যায়। মীরার বাবার অমানিবকতায় যদিও পরে মন্মথ মীরার বাবা মীরার মা সুমনার কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বলে যে কাজটা তার খুবই অন্যায় হয়েছে কিন্তু অভাবে তার মাথার ঠিক ছিল না।

'পাশের ঘর' — প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪২ এর জৈষ্ঠ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশ পায়।

মালতী কলজে পড়ে। বাসেকরে কলেজ যায়, বাড়ির সামনে বাস এসে দাঁড়ায়। বিকালে বন্ধুরা তার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে আসে। মিলি,ঊর্ম্মিলা, লটি এরা আসে। সন্ধ্যায় মালতী মিউজিক এর লেস্ন নেয় এর উপর কলেজের পড়া তৈরী করতে হয়। কাজেই মালতীর সময় বড় কম হাতে থাকে তাই বাড়তি কোন কাজ করার অবসর সে পায় না।

এদিকে বাগানের মালী ঠিক করে ফুলদানিতে ফুল সাজায়নি কিছু বলতে গেলেই মালতীর মা তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। কাজের ঝি-চাকরদের প্রতি তার এ দরদ মালতী সহ্য করতে পারেনা।

জ্যোতিষচন্দ্র নাম করা ব্যারিস্টার বিলেত ফেরৎ, মেয়ে মালতী পিতার আদরে প্রশ্রয়ে নানা বিদ্যায় বিদুষী হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল, আদরে-যত্নে-আহ্লাদে স্বাধীনতার বেড়ে ওঠার জন্য মালতী আর পাঁচজন সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের মেয়ের মত সহনশীল নয়, অন্যের সুখ-সুবিধায় নিজেকে নিয়োজিতযতনা আগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশি সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন, নিজের সুখ-সুবিধা-প্রয়োজন নিয়ে চিন্তিত।

জ্যোতিষচন্দ্র ছোট মেয়ে মালতীকে এভাবে স্বাধীনভাবে মানুষ করার পেছনে একটা কারণ ছিল। জ্যোতিষচন্দ্র তাঁর বড় মেয়ে কমলাকে সেভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। গ্রামে পিতা জীবিত থাকতে তাঁর উপরে কোনো কথা তিনি বলতে পারেননি। তাই ঠাকুর্দা যখন বড় নাতনীর পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দেয় সে সময় জ্যোতিষচন্দ্র আপত্তি করতে পারেননি। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর নিজে ব্যারিস্টার হয়ে ছোট মেয়েকে আধুনিক নানা বিদ্যায় বিদুষি করে মানুষ করে। এরপর দেখা যায় ছোটবোনের সঙ্গে বড় বোনের জীবনের প্রচুরপার্থক্য। এখানে দুটো জীবনকে আলাদা মনে হলেও আসলে এটা আশালতার নিজের বিয়ের আগের জীবন ও বিয়ের পরের জীবনের ঘটনাই গল্পে প্রভাব ফেলেছে। বিয়ের পূর্বের জীবন অর্থাৎ পিতার কাছে বাপের বাড়িতে আধুনিক পরিবারে বেড়ে ওঠা যেন সপ্নের জীবন এবং বিয়ের পরে পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়িতে কুসংস্কারে আবদ্ধ পরাধীন জীবন স্বপ্নভঙ্গের।

'ননীদি' — গল্পটি প্রকাশকাল, প্রকাশনা সংস্থা / পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু জানা যাচ্ছে না।

মীরা নামের যে মেয়েটির রমেশের সঙ্গে বিবাহ হয় সে কলেজে থার্ড ইয়ার অবধি পড়েছে। রমেশ সামান্য বেতনে কোলকাতায় কেরানীর চাকরি করে। খুবই অভাবের সংসার। মীরার শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রুচিজ্ঞান যথেষ্ট। তাই অভাবের সংসারকেও হাসিমুখে নিঁখুতভাবে চালায়। শুধু তাই নয় সে দুপুরে জ্যাম, জেলী,আচার তৈরী করে, সেলাই করে এবং সেই জিনিষগুলি বিক্রি করে কিছু রোজগার হয়। বিকেলে দুটো টিউশুনি করে তা থেকেও কিছু আয় হয়। ঘরে বাইরে দুদিকেই সে খাটে।

পাশের বাড়ির ননীদি অবশ্য তা নয়। প্রৌঢ়া ননীদি শুধু রান্না-বান্না ঘরগৃহস্থালীর কাজই জানে। কাজেই সে বাইরে আলাদা করে কিছু রোজগার করার কথা ভাবতেই পারে না। ঘরের রান্নার সঙ্গে বারে বারে কর্তার চা-পানের আর্জি শুনলেও অত্যন্ত রেগে যান এবং রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার বাক্যবাণে। ননীদি মীরাকেও পরামর্শ দেয় সে যেন অত না খাটে। পুরুষ নারীর ভরণপোষণের ভাব নিয়েছে এবং ভরণপোষণ করে বলেই পুরুষ নারীর স্বাধীনতা, ইচ্ছা অনেক কিছুই হরণ ক'রে তাকে গঞ্জনা দেয়। মীরাকে ননীদি তাই বলেন — 'তোমার বুদ্ধি নেই -তাই ঘরে বাইরে খেটে মর।'[১০১]

মীরা ঘরের সকল কাজ সামলে ডলিদের বাড়ি থেকে টিউশুনি করে কুড়ি টাকা মাসে পান, এছাড়া 'সুরেশ ঠাকুরপোর কারবারে আচার, জেলি, মোরব্বা, ছেলেদের জামা-সুট-ব্লাউজ, এমব্রয়ডারি এই সব পাঠিয়ে যে লাভ থাকে, তাও নিতান্ত মন্দ নয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পরিবর্তন উপন্যাসের শান্তার কথা মনে পড়বে। যে সংসারে আর্থিক সুরাহার জন্য টিউশুনি, লেললাই প্রভৃতি কাজ করতো।

মীরা ননীদিকে বলে যে তিনি যেন ঝগড়া ঝাঁটি না করে ঘর গেরস্থালির কাজ আনন্দের সঙ্গেই করেন, তখন ননীদি বলেন —

> '...এই মুখের জোরেই আজও বেঁচে আচি। তোমার গিয়ে ভোটই বল আর স্ত্রী স্বাধীনতাই বলো — ওসব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বইয়ের পাতাতেই পড়ি। কই, আমাদের কোন কাজে আসে কি? পুরুষমানুষের অত্যাচারে এতদিন কোন্ কালে তলিয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতাম - যদি না এই মুখের জোরটুকু থাকত।''[১০২]

'বিনা পণের মর্য্যাদা' — মাসিক বসুমতী, ১৩৪৭ এর কার্ত্তিক সংখ্যা আশালতার এই গল্পটি প্রকাশিত হয়।

বিয়েতে কন্যার পিতা মাতাকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতে রাখতে হয় নইলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে - এমনই সঙ্কট দেখা দিয়েছে চামেলীর বিয়ে দিতে চামেলীর মা বাবার। চামেলী মাধ্যমিক পাশ পরেছে, বাড়িতে পড়াশুনা করছে, আই-এ পরীক্ষা দেবে। গান জানে, দেখতে সুন্দরী অথচ ভালো পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না কারণ তার পিতা মোটা অঙ্কের টাকা জোগাড় করতে পারছে না।

চামেলী পিতা শিবনাথবাবু কেরানীর চাকরি করে,স্ত্রী কমলা বি.এ পাশ, সে নিপুণভাবে সংসার চালায়। মেয়ে চামেলীকে সেই গান শিখিয়েছে। তাই ভদ্রভাবে তেকে অতি কষ্টে খুব সামান্য টাকাই জমিয়েছেন ইতিমধ্যে শিবনাথ একটি পাত্রের সন্ধানএনেছে, পাত্রটির গ্রামে নিজস্ব বাড়ি, জমি জায়গা আছে, কোলকাতার কলেজে বি.এ পড়ে। এরপর ল পড়বে। মেয়ে পছন্দ হলেই বিয়ে করবে, পণ লাগবে না।

গ্রামে বাড়ি শুনেই কমলা আপত্তি জানায়। তার মতে- '...ম্যালেরিয়া আছে, তা'ছাড়া যত অশিক্ষিত লোকের বাস! অমার্জ্জিত বুনো জায়গা।'[১০৩]

এর কিছুদিনের মধ্যে কমলার খুরতুতো বোন গায়ত্রী দেবীর মেয়ে পাকা দেখা উপলক্ষ্যে রবিবার তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। শিবনাথ প্রথমে যেতে রাজি না হলেও যখন শোনে পাত্রপক্ষ কোন পণ নিচ্ছে না তখন যেতে রাজি হয়। সেখানে গিয়ে কমলা দেখে মুখে তারা কোন টাকার অঙ্ক সরাসরি পাত্রীর পক্ষের থেকে নিচ্ছে না ঠিকই কিন্তু পাত্রীকে যেসব গহনা দিয়ে পাত্রী পক্ষ সাজাবে তা যেন হীরের গহনাই হয়, ফার্নিচার যা দেবে তাও যেন তারা যে দোকান থেকে ফার্নিচার তৈরী করে সেখানকার ভালো বাছাই করা জিনিসেরই যেন হয়। শাড়ী কাপড় ভালো বড় দোকান থেকেই যেন কেনা হয় কারণ যেমন ঘর তেমন মানানসই জিনিস না হলে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এরা অপচ্ছন্দ করতে পারে — কাজেই সেসব দিকে পাত্র পক্ষ বারে বারে বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সেখান থেকে ফিরে শিবনাথও তাই কমলাকে কটাক্ষ করে বলেন যে — '... বিনা পণের বিয়ে কেমন দেখে এলে?'[১০৪]

কমলাও স্বামীকে বলেন যে গ্রামের সেই শিক্ষিত যুবকটির সঙ্গেই যেন শিবনাথ মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলে।

‘তৃষ্ণা’ — আশালতা সিংহের এই গল্পটি মাসিক বসুমতীতে ১৩৪৮ এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গল্পে হরকুমার বাবুর দুই মেয়ে। বড় মেয়ে সুভাষিণী, ছোট মেয়ে সুনীতি।

প্রথম জীবনে হরকুমার বাবু গ্রামে থাকতেন। গ্রাম্য রীতি নীতি সাবেক কালের নিয়ম মেনে বড় মেয়েসুভাষিনীর বিবাহ দেন জমিদার ঘরে। সেখানে রীতি পদ্ধতি সবই সেকেল ধরণের।

কিন্তু বহু দিন হল হরকুমার বাবু কোলকাতায় থাকেন, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তিনি। কোলকাতায় এসে হরকুমার বাবুর যেমন পরিবর্তন হয়েছে সেইসঙ্গে তার স্ত্রী এবং ছোট মেয়ে সুনীতিরও আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে। সেই সুনীতির বিবাহ ঠিক হয়েছে শিক্ষিত-উদার-আধুনিক কেতাদুরস্ত পেশায় ডাক্তার সুবোধ এর সঙ্গে। সুবোধ এর নিজস্ব বাড়িও আছে বালীগঞ্জে, দেখতেও বেশ। ‘... গৌরবর্ণ, ছিপছিপে দেহ, মুখ একটি নম্র সুকুমার ভাব।’ [১০৫](পৃ. ২০৩)

বড় মেয়ে সুবাষিণীর প্রিত্রালয়ে আসা তেমন হয় না কারণ তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খবর পেয়েছে সুভাষিনীর পিতৃপরিবার এখন আর সেকেলে রীতি-রেওয়াজে বিশ্বাসী নয়। যদিও সুনীতির বিয়ে উপলক্ষ্যে সুভাষিণী স্বামী-ছেলেমেয়ে-ঝি-চাকর সমতে বাপের বাড়ি এসেছে।

এসেও শান্তি নেই সুভাষিণীর। পদে পদে তার স্বামী তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে জমিদার ঘরের কূলবধূ কাজেই সুনীতার ভাবী স্বামীর সঙ্গে দুটো ভালো কথা বলা কিংবা রাস্তা দিয়ে কোন স্বদেশী দলের বন্দেমাতরম আওয়াজ তুলে যাওয়ার দৃশ্যও তার দেখতে পাওয়ার অধিকার নেই।

সুভাষিণীর স্বামী ত্রৈলোক্যের কথায় — ‘‘... আজ সন্ধ্যাবেলায় জানালার ধারে অমন ক’রে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? এই নিয়ে আমার কাছে কত গালাগালি খেয়েছ, বোধ হয় মারও খেয়েছ; কূলবধূ যে, তার জানালার ধারে দাঁড়ানো কেন?’[১০৬]

উক্ত কথা থেকে সুভাষিণীর স্বামীর রুচির অভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। শুধু তাই নয় তিনি কীভাবে তার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালান তাও পাঠক বুঝতে পারে। সুভাষিণীও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এবং স্বামীর মন রক্ষার জন্য আধুনিকতাকে বিশেষত বোনের ভাবী স্বামীর সঙ্গে কথা বলা কিংবা বন্ধু বান্ধব সহ ঘোরা ফেরাকে যতই খ্রীস্টানি ব্যাপার বলে তাচ্ছিল্য করুক কিন্তু আকূল তৃষ্ণায় কখন যেন তার বুকটাও মোচড় দেয়।

'চির নবীন' — গল্পটির প্রকাশকাল জানা যাচ্ছে না। গল্পটিতে দেখি মালতিকে। মালতি বিয়ের আগে লেখাপড়া, গান-বাজনা, সেলাই এমন কি ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ যথেষ্ট যত্নসহকারে শিখেছিল। মালতীর চেহারাও খুব সুন্দর। এমন রূপবতী, গুণবতী মালতীর বিয়ে হয় উকিল বিজয় চন্দ্রের সঙ্গে। বিজয়বাবু বছর ছয়ের হল পশ্চিমের একটি নামকরা শহরে ওকালতি করছেন। কিন্তু তাঁর একেবারেই পসার নেই। তাই মালতীর পক্ষে ওই অল্প আয়ে সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে পড়ে। মেয়ে সুধীরা সাত-আট বছর বয়স। তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে মানুষ করছে মালতী। পাড়ার বিখ্যাত উকিল শ্রীষ বাবুর পুত্রবধূ শান্তিদেবী মালতীর বিশেষ বন্ধু। শান্তিদেবীর ননদ ইলাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে, তাই পাত্রীকে সাজানোর জন্য মালতীকে ডেকে নিয়ে যায় শান্তিদেবী। 'ইলাকে মালতী আপন মনের মতো সাজিয়ে দিয়েচে।'[১০৭]

পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। শান্তিদেবী বলেন —

> 'তোর পয় আছে রে, তুই না এলে আমি আর অমনই করে সাজাতে পারতুম-না অত সব আমার আসত। ওদের মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছে ভাই। তোরও হাতের গুন।'[১০৮]

মালতীর সংসারে নিত্য অভাবের জন্য দিশাহারা স্বামী বিজয় স্ত্রীকে দায়ি করে এবং রাগের মাথায় বলেছিল —

> ' তোমার হাড়ে লক্ষ্মী নেই। সংসারে কত কত মেয়ে দেখা যায়, যাঁরা ঘরে পা দিতে না দিতেই ঘরের অবস্থা ফিরে যায়। সংসারের শ্রী উথ্‌লে ওঠে। তাই না কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। আর তোমাকে দেখ না, যখন থেকে তোমাকে বিয়ে করেচি, দুঃখ-কষ্টের আর পার নেই।'[১০৯]

সংসারে সবকিছুর জন্য মেয়েদেরই দায়ী করা হয়। রূপবতী গুণবতী মেয়ের ভাগ্যও নির্ভর করে বিয়ের উপর। মেয়েটির কেমন ঘরে কার সঙ্গে বিয়ে হল, সেটাই মেয়েটার ভালো থাকা কিংবা মন্দ থাকা নির্ভর করে। এ থেকে যেন তাদের মুক্তি নেই।

'সাধনার ফল' — ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয় আশালতা সিংহের এই গল্পটি।

রেবা রায় — হেডমিস্ট্রেস্ বয়স কুড়ি-একুশ। ছাত্রী নমিতা ম্যাট্রিকে খুব ভাল ফল করায় খবরটি দিতে তিনি নিজে নমিতদের বাড়িতে এসে দেখেন নমিতার পিসীমা অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত এবং সেকেলেপন্থী।

নমিতাকে দিয়ে আচার রোদে দিচ্ছেন। নমিতার দিদিমণি রেবাকে দেখে মোটেই খুশি হননি এবং এ ধরণের বেহায়া মেয়েও যে আছে তা যেন খ্রীষ্টানী ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয় সেটাই পিসীমা মনে করেন। এই পিসীমার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ রেবা যখন উঠি উঠি করছেন তখন নমিতার ছোড়দা পেশায় অধ্যাপক রমেন পাশের ঘর থেকে উঠে আসে এবং রেবা রায়ের সঙ্গে আলাপ করে বলে যে তাদের এই হিন্দু বাড়িটি ভারতবর্ষের একটি ছোট সংস্করণ। এখানে প্রাচীনপন্থী শুচিবায়ুগ্রস্ত পিসীমা যেমন আছেন তেমনি প্রগতিশীল রাঙা বৌদি বিংবা পড়াশুনায় আগ্রহী আধুনিক মেয়ে নমিতাও তেমনি আছে। কাউকে বাদ দিয়ে এরা থাকে না। কাজেই রেবা দদিমণি যেন বিষয়টাকে অনধাবনকরে পিসীমার ওপর রেগে গিয়ে তাড়াতাড়ি এ বাড়ি থেকে চলে না যান।

পরে রেবার কাকা এ শহরে বদলি হয়ে এলে কাকাবাবু এবং রমেনের বড় দাদার মধ্যস্থতায় রমেনের সঙ্গে রেবার বিয়ে হয়। বিয়ের পর রমেন বিলেত যাবে সেক্ষেত্রে রেবা তার কাকার ওখানে থাকতে চায় কি না তা জিজ্ঞাসা করতে রেবা জানায় ‘‘পিসীমা একটু আচার বিচার মেনে চলেন বলেই যে নিজের বাড়ী ছেড়ে আমায় থাকতে হবে তার কোন মানে আছে কি?’’[১১০] এছাড়া রেবা বলে যে এখন ‘স্কুল মাস্টারিও তার ধাতে সইবে না। বলা বাহুল্য এতে রেবার স্বামীসহ সকলেই খুশিই হবে। একজন আধুনিক সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্বময়ী মেয়েকে কীভাবে আদর্শের বাণী শুনিয়ে, সনাতন ভারতবর্ষের দোহাই দিয়ে তার স্বাধীন উপার্জন করা কিংবা নিজের মনের মত করে চলার পথে কাঁটা দিয়ে সংসারের ঘেরাটোপে সকলের সুবিধার্থে ভালো বৌ এর তকমা নিয়ে নিশ্চল করে দেওয়া যেতে পারে এ গল্পটি তারই প্রমাণ।

‘‘ঐ স্কুলমাস্টারি আমার ধাতে সইবে না’’[১১১] — এ ধরনের পাগলেরপ্রলাপ কোন স্বাধীন রুচিশীল মেয়ের পক্ষে বলা সম্ভব? আশালতা তাঁর গল্পের নায়িকা রেবার মুখে এ ধরণের কথা বসিয়ে নারীর উপরিতলের কথার আড়ালে যে আসল কথাটি লুকিয়ে রয়েছে তা বের করার দায়িত্ব রেখে গেছেন পাঠক গবেষকদের ওপর।

‘মৃত্যুর আলো’ — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা ‘মৃত্যুর আলো’ গল্পটি ১৩৪৫-এর আষাঢ় সংখ্যায় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে একটি উচ্চমধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবার দেখি। শিক্ষিত এই পরিবারের বড় ছেলে ডাক্তার, তার ভালোই পসার। ছোটো ছেলে বিসিএস পরীক্ষার

প্রস্তুতি নিচ্ছে। তুলনায় মেজ ছেলেটি তেমন কিছু করতে পারেনি। সে ইন্‌সিওরেন্সের দালালির কাজ করে। বড় এবং মেজ ছেলের বিয়ে হয়েছে। বড় বৌ আই.এ. পাশ। কিন্তু মেজ বৌটি বি.এ. পর্যন্ত পড়েছে। বড় বৌ ইন্দুর তুলনায় মেজ বৌ কিরণ সুন্দরীও বেশি। কিরণ প্রায়ই বলে — 'মেয়ে মানুষের রূপই বলো আর গুণই বলো — কিছুই কোনো কাজে আসে না যদি না তার বরাত ভালো হয়। আমি এইটে এতবার দেখেচি যে রূপগুণের উপর আর আমার শ্রদ্ধা নেই।'[১১২] । বড় বৌ ইন্দু তার ছেলে ও মেয়ের গরম কোট তৈরীর জন্য বাজারে যাওয়ার সময় শাশুড়ী মধ্যম পুত্রের ছেলে ও মেয়ের জন্য কোট আনার অর্থ দেয়। কিন্তু কুটিল, স্বার্থান্বেসী, পরশ্রীকাতর বড় বৌ মাথা ধরার অজুহাত দিয়ে সেদিন আর বাজারে কোট কিনতে যায় না। বড় ভাসুর তার ভাইয়ের ছেলে ও মেয়ের জন্য কোট কিনে এনে দিলে মেজ ভাইয়ের মেয়ে লিলি নতুন কোট পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে খেলতে খেলতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ডিপ্‌থিরিয়া হয় এবং সে মারা যায়। লীলর মৃত্যু মধ্য দিয়ে বড় বউ ইন্দু নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়।

গল্পটিতে শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের কৃত্রিম ভালোমানুষী, স্বার্থপরাতা, ঈশ্বাকাতর রূপটি লেখিকা আশালতা তুলে ধরেছেন।

'স্বরূপ' — মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৪৫ সালে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়।

তরলা বসু, তটিনী মিত্র এরা আধুনিক প্রগতিশীল মহিলা নানা প্রগতিবাদী কাজকর্ম করতে এরা মিটিং, সভা করেন, তরলা বসুর স্বামী করণকান্তি বসু পেশায় ডাক্তার, খুবই ভালো পসার, তরলার শ্বশুরেরও যথেষ্ট নাম-ডাক, টাকা-পয়সা ছিল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর শাশুড়ী এসেছেন ছেলের কাছে। খাস ঝিকে সঙ্গে নিয়ে। একটু শুচিবায়ু গ্রস্ত প্রচীনপন্থী শাশুড়ি বেশ কিছুদিন আছেন। স্থির করেছেন কোলকাতায় যেহেতু ছেলে এবং মেয়ের ঘর তাই এখানেই থাকবেন। তরলা ভেবেছিল শাশুড়ি কিছুদিন থেকে চলে যাবেন কিন্তু যখন দেখল এ সংস্থার তিনি বররাবরের জন্য রয়ে যাচ্ছেন তখন যেন তার সহ্যের সীমা ছাঁড়িয়ে গেল। স্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও তরলা চাকরদের দিয়ে এমন ছোঁয়া ছুঁয়ি করালেন যে শাশুড়ি প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে মেয়ের ওখানে থাকতে মনস্থ করে মেয়েকে চিঠি লিখতে বসলেন।

ওদিকে তটিনী মিত্রর স্বামী কোন এক হত দরিদ্র ছেলেকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চান। এতে তটিনী দেবীর ঘোরআপত্তি কারণ '...বনেদী ঘরে ওসব চালচুলোহীন পথের লোককে'[১১৩] জায়গা দেওয়া সম্ভব না। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে রীতিমত অশান্তি।

এদিকে তরলার শ্বাশুড়ী যখন মেয়ের ওখানে থাকা মনস্থির ক'রে জিনিষপত্র গোছগাছ করছেন

সেসময় তরলার স্বামী ডাক্তার করুণকান্তি বাবু স্ত্রীকে বলেন যে মায়ের যে দেড় লক্ষ টাকা আছে সেটা অচিরে মেয়েকে দিয়ে যাবেন কারণ তিনি তখন মেয়ের কাছেই থাকবেন। এ কথা শুনে তরলার মাথায় হাত। তরলা তখনি মাথায় ঘোমটা দিয়ে শাশুড়ির কাছে যান ক্ষমা চেয়ে তাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখবার জন্য কারণ দেড় লক্ষ টাকা কম নয় অন্তত আজ থেকে একশো সোয়াশো বছর আগে।

'নতুন প্রথা' — মাসিক বসুমতি, আশ্বিন, ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত হয় আশালতার এই গল্পটি

মেয়েদের বিয়ে নিয়ে মেয়েদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। যুগের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারেও অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

আজাল আবার মায়েরা তাদের মেয়েদের সাজিয়ে গুজিয়ে বিভিন্ন পার্টিতে যায় যেখানে অবিবাহিত বড় বড় চাকুরে পয়সাওয়ালা যুবকেরাআসে, ঐ যুবকদের কোন মেয়েকে পছন্দ হয়ে গেলে সেই মেয়ে এবং মেয়ের অভিভাবক তাদের জীবন সার্থক বলে মনে করে। এই কালেরই মেয়ে মুক্তি কিন্তু তা মনে করে না।

যদিও ননীদির সময়োচিত বার বার দেওয়া উপদেশের কথা স্মরণ কানিকটা ভয়ে ভাবনায় ঊর্ম্মিলাদেবী তার মেয়ে মুক্তিকে নিয়ে হাতীয়ারের পার্টিতে যান। পার্টিতে মুক্তি একটি সোফায় বসে নীরবে দেখছিল কীভাবে মেয়েরা এবং তাদের মারা বাড়িয়ে চড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য— পুরুষদের আকৃষ্ট করতে হবে অন্তত একজনকে ফাঁদে ফেলতেই হবে সে যে করেই হোক - নিজের সৌন্দর্যের জাল বিস্তার করে, কিংবা গান শুনিয়ে অথবা নিজের রুচির পরিচয় বানিয়ে বানিয়ে বলে কোন মেয়ে তেমনভাবে নিজেকে জাহির না করলে তার মা আড়ালে ডেকে মেয়েকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে করেই হোক একটি ছেলের মন জয় করতেই হবে— এমন নির্লজ্জ বেহায়াপনা দেখে মুক্তির মন যখন পালাই পালাই করছে এমন সময় দেবজ্যোতি নামক যুবকটির সঙ্গে হঠাৎ তার চোখাচোখি হয় এবং দেবজ্যোতির মনে মুক্তির ঐ দৃষ্টি বিশেষ আলো জ্বালিয়ে দেয়। দেবব্রতর কথায় — ''আপনার চোখের মাঝে আমি এমন আলো দেখতে পেয়েচি, যা আর কোথাও খুঁজে পেলুম না।'' [১১৪]

যদিও এমন স্তুতি বাক্যে মুক্তির মন ভেজে না। ঊর্ম্মিলা দেবীও বলেন তেমন মনে করলে 'আপনি বরঞ্চ একদিন যাবেন আমাদের বাড়িতে ...'[১১৫] অনেক রাত হওয়াতে ঊর্ম্মিলা দেবী মেয়ে মুক্তিকে নিয়ে ফিরে আসেন।

এরপর দেবব্রতবাবু মুক্তিদের বাড়িতে এলে মুক্তি বলে যে মিসেস্ হাতিয়ারের পার্টিতে গিয়ে যা

দেখে এসেছে তাতে সে এই নতুন প্রথায় বিয়ে করবে না কারণ ঐ পার্টিতে তার কথায়—

> '' দেখে এলুম চারদিকে ভিক্ষার নীরব এবং সরব ব্যাকুলতা। ... মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, গান বাজনা শিখছে,সাজসজ্জা করছে কেবল কি এই জন্য? তাদের সমস্ত অস্তিত্ব ব্যকুল স্বরে ভিক্ষা করছে — ওগো আমায় নাও, আমায় নাও।''[১১৬]

দেবব্রতর মনে হয় '...সংসারে দৈবাৎ এমন এক একজন মেয়ে চোখে পড়ে, যাঁর ভিক্ষা করবার কোন দায় নেই।'[১১৭]

'বান্ধবী' — মাসিক বসুমতী ১৩৪৭ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল গল্পটি।

মালতি - কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, আধুনিকা, দেশের কাজেও সে এগিয়ে গিয়েছে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বিভিন্ন সভা সমিতিতেও যোগ দেয়। অনেক সময় কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এসব কাজে বিভিন্ন সভা সমিতিতে গেলেও সমাজে কথা হয় — যেদিকে লক্ষ্য করেই নিবাররণ বাবু কন্যা মালতীর বন্ধু সুজিত চক্রবর্তী যে কিনা নিবারণ বাবুরই পাল্টা ঘর তাকে ডেকে বলেন যে এতে মালতীর কোন ক্ষতি হতে পারে, কাজেই বেশি মেলামেশা না করাই শ্রেয়। এতে সুজিতবাবু জানান তার দ্বারা মালতীর কোন ক্ষতি হবেনা এবত মালতীরও যে সুজিত-এর সঙ্গ ভালোই লাগে — এটাকে নিবারণবাবু তাদের প্রেম ভালোবাসা বলে ভুল করে।

কিন্তু এ ভুল ভাঙ্গে সুজিতের কথাতেই, কোরক দাসও যেমন মালতীর বন্ধু সুজিতও তেমনি, আর সুজিতের মালতীকে কোন সময় যদি বিশেষ ভালো লেগে থাকেও সম্প্রতি সেরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা পড়েছে এবং তাই তার উপলব্ধি — 'মালতী দেবী চিরদিনই আমার বান্ধবী থাকুন। তিনি যেন ঐ উদার আকাশ।গম্ভীরমধ্যে টেনে এনে তার আমি অপমান করতে চাইনে।'[১১৮]

কাজেই নিবারণ বাবু অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীর কথাই স্মরণ করেন - দেখে শুনে মেয়েকে পাত্রস্থ করাই ভালো। সভা-সমিতিতে গিয়ে কাজ নেই কারণ সমাজ তো শুধু মেয়েকেই বদনাম দেবে, তাকেই শাস্তি দেবে, তার জন্য সমাজের হাজারো প্রশ্ন হাজারও বিধি নিষেধ।

ধনী ঘরের ছেলে সুজিত চক্রবর্তী এখন এই গরমে দার্জিলিং এবং কিছুদিন পরে বিলেতে পাড়ি জমাবে।

'মা' — প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪২ ভাদ্র-সংখ্যায় আশালতা সিংহের এই গল্পটি প্রকাশিত হয়।

রূপবতী, শিক্ষিতা, গুণবতী অরুণাপড়াশুনার পাশাপাশি গৃহকর্মও যেমন শিখেছে তেমনি সে গান জানে, এস্রাজ বাজায়। এমন মেয়ে অরুণার সঙ্গে সন্তোষকুমারের বিয়ে হল। শ্বশুর বাড়িতে শুধু শাশুড়ি আছেন। ছেলে সন্তোষেরজীবনে মা'কে কেন্দ্র করেই এতদিন আবর্তিত হচ্ছিল। বর্তমানে স্ত্রী এসেছে। কিন্তু মাতৃভক্ত সন্তোষ মা যাতে এতটুকু আঘাত না পান সে ব্যাপারে সতর্ক আর সেজন্য গান পছন্দ করা সত্ত্বেও সে স্ত্রীকে বলে এমনভাবে গান সে করবে যাতে ঘরের বাইরে কেউ গান না শুনতে পারে। কোন বাদ্য যন্ত্র ছাড়াই শুধু গুন গুন করে খালি গলায় যদি শোনাতে চায় তাহলে শোনাতে পারে। বলা বাহুল্য অরুণার মতো তীক্ষ্ণ মেধাবী মেয়ে বুঝতে পারে যে তার গান এবার বন্ধ হলো।

সন্তোষ মাঝে অসুস্থ হলে অরুণা নিপুণ হস্তে ডাক্তারের নির্দেশ মত সেবা শুশ্রুষা দিয়ে স্বামীকে সারিয়ে তোলে। সেরে উঠলেও শরীরে কিছু দুর্বলতা থাকার জন্য অরুণা রোগীর পথ্যই সব সময় দেয় সন্তোষকে। কিন্তু দিন রাত রোগীর পথ্য খেতে ছেলের যে কষ্ট হয় তা উপলব্ধি করে মা সন্তোষকে ডেকে লুচি, তরকারি, মিষ্টি, চা সহযোগে প্রাতঃরাশ করান। এদিকে ছেলের টাইফয়েড হলে সেই মা কেবল ভগবানের কাছে মাথা কুটে পড়ে থাকেন। এসব দেখে অরুণা ভাবে অজ্ঞ মা লেখাপড়া জানেন না তাই ডাক্তারের কথা অনুযায়ী সেবা সুশ্রুষার মহিমা কিছুই বোঝেন না। এসব শুনে সন্তোষ বলে যে মায়ের মন অতশত বোঝে না ঠিকই কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হয় একথা সে তখনই উপলব্ধি করবে যখন সে নিজেও মা হবে।

বেশ কিছু বছর পরে অরুণার ছেলে যখন দু'বছরের সে সময় তার সর্দ্দি অসুখ হলে অরুণাও ডাক্তারী নির্দেশ মত শুধু মাত্র ওষুধপত্র দিয়েও ক্ষান্ত হতে পারে না বরং খোকাকে দেখাশোনার জন্য সন্তোষকে নার্স রাখতে হয়। অরুণা দিন রাত ঠাকুরের কাছে বসে প্রার্থনা করে। খোকা সেরে উঠলে অরুণা ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বলে — ''ভগবান, তুমি রক্ষা কর। আর কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই।''[১১৯]

'অতিথি' — প্রবাসী, ১৩৪৫ পৌষ-এ প্রকাশিত।

সমাজ-পরিবেশ যখন মেয়েদের ওপরে শ্রদ্ধা রাখে না, তার কাছে বড় কিছু দাবি না করে ছোট করে খাটো করে ভাবতে শেখায়, তাকে বাধ্য করে অভাবের মধ্যেও সকলকে ভাল রাখার বাধা বরাদ্দমাফিক কাজ করতে তখন মেয়েরা সেই শ্রদ্ধাহীন কাজে নিজেদেরও ছোট করে ফেলে। আশালতা

সিংহের অতিথি গল্পের প্রতিমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা সেদিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন।

পিতৃমাতৃহীন প্রতিমা মামার কাছে মানুষ, প্রতিমা যখন কলেজে পড়ে সেই মামা তখন মারা যান। প্রতিমার দিদিমা অতি কষ্টে এক পোষ্টমাস্টারের সাথে তার বিয়ে দেন। মামার বাড়িতে থাকতে প্রতিমার সন্তোষ নামক এক যুবকের সাথে পরিচয় হয় যে প্রতিমার এস্রাজ বাজিয়ে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রতিমাকে তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছিল সেই শ্রদ্ধাপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি প্রতিমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার শিল্পী সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। নিজের ওপর তার শ্রদ্ধা গিয়েছিল বেড়ে। কিন্তু বিয়ের পর দৈনন্দিন ক্ষুদ্রপরিসরে অল্প টাকায় দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে চলতে গিয়ে প্রতিমার মানসিক দৈন্যতা বেড়ে গিয়ে তাকে করে তুলেছিল খিটখিটে।

প্রতিমার স্বামী হঠাৎ একদিন সেই সন্তোষবাবুকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এলে প্রতিমা তার দৈন্যতা, রুঢ় কর্কশরূপ অতিথির সামনে যাতে প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। প্রতিমা যখন বলে যে সে আর গান গায় না তখন সন্তোষ বলেন যে —

> ‘‘তার কারণ ক্রমশ মন হচ্ছে যে গান গাইতেন একদিন, আজ সে গানের সুকুমার সুরটিকে নিজের জীবনে আর গৃহস্থালীতে ব্যপ্ত ক’রে দিয়েছেন।’’ [১২০]

আর প্রতিমার স্বামী রাখালবাবুর কথায় —

> ‘‘হ্যাঁ, মেয়েমানুষে ঘর কন্নার কাজ নিখুঁত ক’রে চালাতে পারলে তবেই বাহাদুরি তাকে দিই। সেটা উচিত বটে। খুবই উচিত।’’[১২১]

আপাত দৃষ্টিতে দুটো বক্তব্যের উপস্থাপনার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বক্তব্য কিন্তু একই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকল প্রতিনিধি চায় মেয়েরা ঘরের লোকের সুখ-সুবিধার জন্য শুধু খাটবে মুখে হাসি নিয়ে তাতে তাদের গান বাজনা ছাড়তে হয় হবে।

মেয়েরাই এই চাওয়াকে দোষের মনে করে না শুধুমাত্র চাওয়াটা শুধু বড় করে চাইলে তাদের সেই খাটুনি, ত্যাগও গায়ে লাগবে না।

গল্পটিতে মেয়েদের মর্যাদা অন্বেষণের সাথে তৎকালীন সমাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের অবস্থানটিও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন লেখিকা। নিজে মেয়ে বলেই হয়তো বিষয়টি এত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি।

‘নারীর মূল্য’ — প্রবাসী ১৩৪৫ জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত

বাঙালী ঘরে ছেলে-মেয়েতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল, বর্তমানেও আছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেই লেখিকা প্রথমেই জানাচ্ছেন তিন মেয়ের পর নীরজার ছেলে হওয়াতে ঘন ঘন শাখ বাজছে নীরজার শ্বশুরবাড়িতে। ছয় ষষ্ঠীতে দানধ্যান ঘটাপটা আরও হবে।

নীরজাদের পাশের বাড়ি শোভাদের। শোভা একমাত্র সন্তান। শোভার পিতা ছেলে মেয়েতে পার্থক্য না মানলেও শোভার মায়ের মনোভাব কিন্তু তা নয়। তার মতে — সমস্ত কিছুর জন্যই বাঙ্গালী মেয়েকে আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হয় কারণ বিয়ের আগে বাপ মায়ের আদর পেলেও বিয়ের পর কেমন শ্বশুরবাড়ি-স্বামী জোটে তার ওপর মেয়েদের অনেক কিছু নির্ভর করবে। শোভার পিতা বিষয়টাকে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

এ অবস্থা মেয়েদের শুধু দক্ষিণবঙ্গে নয়, পূর্ববঙ্গেও। সেখানে মা বাবা ততদিনই মেয়েদের লেখাপড়া গান বাজনা শেখায় যতদিন না সে সুপাত্রস্থ হয়। যেন ভালো বিয়ে হওয়াই মেয়েদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ছাদে সন্ধ্যার সময় উঠে পাশের বাড়ির বোসেদের মেয়ে নিরুর বিশ্রী গান বার বার শুনতে শুনতে বিরক্ত শোভার বাবা গিন্নীকে ঐ গান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে গিন্নী জানান যে মেয়েটি গান জানত না বলে পাত্রপক্ষ নাকচ করায় মেয়েটি উঠে পড়ে লেগেছে গান শিখতে।

একথা শোনার পর বিরক্তির বদলে করুণারই উদ্রেক ঘটে শোভার পিতার মনে।

‘প্রতিক্রিয়া’ — প্রবাসী ১৩৪৭ এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

গিলবার্ট গুবারের যে তত্ত্ব—মেয়েদের লেখার উপরিতলের নীচে আসল বক্তব্য লুকিয়ে থাকে ঠিক যেমন তার আপাত চেহারার পেছনে আসল মানসিকতাকে সে চেপে রাখে। এই তত্ত্বেরই প্রকাশ আশালতার লেখা এই গল্পটি।

নির্মলা চরিত্রটির মধ্য আশালতা যেমন তাঁর নায়িকার দ্বৈতসত্তার প্রকাশ দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি স্বয়ং লেখিকাও যেন বোঝাতে চেয়েছেন মেয়েরা যা লেখে তা সব সত্যি নয়, ঐ লেখার ভেতরের তাৎপর্য নিষ্ঠাবান পাঠক-গবেষককে বুঝে নিতে হবে।

গল্পটির শুরুতেই আশালতা লিখছেন — ‘শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর সমাজে বেশ একটু মান সম্ভ্রম আছে। মাসিক পত্রে তাঁর কয়েকটি রচনায় ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে। সে রচনাগুলির বিশেষত্ব এই যে,

তাতে আধুনিকতার সমর্থন কোথাও নেই।'[১২২] অর্থাৎ আধুনিকতার সমর্থন নেই জন্যেই সমাজ তার প্রবন্ধগুলিকে বরদাস্ত করে তাকেও মান দেখাচ্ছেন। তিনি যদি আধুনিকতাকে সমর্থন করতেন তাহলেও কি তার মান থাকত? তার লেখায় আরও যাকে — নারীর একমাত্র ধর্ম- গৃহকে গৃহের মানুষজনকে সুখী করা, সেই গৃহ যদি তার কাছে দুঃখেরও হয় তবু তাকেই বরণ করে আজীবন হাসিমুখে সেখানে খেটে খেতে হবে। এমন ধরণের কথা যে মহিলা নিজে মহিলা হয়েও লিখতেপারেন তিনিই তো আদর্শ মহিলা।

নতুন কোন মেয়ে স্কুল উদ্বোধন হলে লোকে নির্ম্মলাদেবীকে গিয়ে ধরেন কারণ তিনি মেয়েদের আদর্শ শিক্ষা কী হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে লিখে দেন। সব কালেই কিছু আপাত বাধন ছাড়া সমাজ যাকে পাগল ছিটগ্রস্থ আখ্যা দেয় তেমন মেয়েও থাকে। দত্তবাড়ির ইলা তেমনই এক মেয়ে যে রাত বিরেতেও ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে।গান করে — এ হেন মেয়েকে সমাজের কি বরদাস্ত হয়? তাই নির্ম্মলাদেবী কোমর বেধে নামলেন ইলার পিসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে। মিসেস বোস যে ইলার পিসী তারই বাড়িতে নির্ম্মলা যান তাকে বোঝাতে ইলা যেন বাড়াবাড়ি না করে মিসেস বোসের বাড়িতে বিশেষ অতিথি আসবে বলে তিনি আধঘন্টার জন্য উঠে যান। সেইসময় আকাশে মেঘের ঘনঘটা, এমন পরিবেশে পূর্বেকার কিছু ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকে উঠে আসে —

নরেন সাহা — সাহা পদবী ঠিক কায়স্থও নয় এমন একজনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয় উপরন্তু নরেনের মা যক্ষ্মায় মারা যান — কাজেই নরেন যত ভালো ছেলেই হোক নরেনের সঙ্গে নির্ম্মলার কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না, যতই নির্ম্মলা-নরেন পরস্পরকে ভালোবাসুক। নির্ম্মলার বাবা মেয়েকে অত্যন্ত স্নেহ করলেও নরেনকে নির্ম্মলা খুবই পছন্দ করে জেনেও তিনি নির্ম্মলার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন —

> ''মা নিম্মর্ল, মেয়েদের জীবনের চরম কথা ত্যাগে, সুখভোগে নয়। ... জাতির সমাজের ভবিষ্যৎ জীবনধারা অদৃশ্য আকারে তোমার মধ্যে বইছে। তাকে নিম্মর্ল করে প্রবাহিত করার ভার তোমার উপরে। ... তোমার দায়িত্ব অনেক।''[১২৩]

সেসময় নির্ম্মলা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন আধুনিক যুগের মেয়ে ইলা তা মেনে নেয় না। সে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলে।

'মনস্তত্ত্ব' — আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৪৫ এর বার্ষিক সংখ্যায় আশালতা সিংহের মনস্তত্ব গল্পটি বের হয়।

গল্পনাম মনস্তত্ব শুনেই আন্দাজ করা যায় মানুষের মনের বিচিত্র গতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়েছে গল্পে। গল্প কথক জানাচ্ছেন তিনি মাসিকপত্রে মেয়েদের আধুনিকতা তথা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ ক'রে প্রবন্ধ লেখেন আর তাতেই তার সমাজে বেশ প্রতিপত্তিও রয়েছে। তার স্ত্রী দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়ে লেখাপড়ায় ইতি টেনেছেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত এই স্ত্রী রান্না ভালোই করেন সেই সঙ্গে স্বামীর লেখার প্রশংসাও। এদের মেয়ে নবছরের সুবোধিনী আর কয়েকটি ছেলে রয়েছে। মেয়েটির পড়াশুনায় অত্যন্ত আগ্রহ পাশের বাড়ির ছেলে মেয়েদের যখন অবনী মাস্টারমশায় পড়াতে আসেন সে সময় সুবোধিনী তার কাছে গিয়ে অনেকটা লেখাপড়া শিখে ফেলেছে পিতা-মাতার অজান্তেই। মেয়ে সুবোধিনী তার পিতাকে ধরেছে যে সে স্কুলে ভর্তি হবে। এ কথায় পিতা ভবিষ্যত জাতি গঠনের ভার মেয়েদের ওপর নির্ভর করছে আর ন বছরের হিন্দু বাঙ্গালী মেয়ের রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকর্ম শেখা উচিত বলে যখন পিতা বোঝানোর চেষ্টা করেন তখন মেয়ে বলে যে স্কুলের দিদিমনি ''ননীদি বারোমাস নিজের রন্না করেন আর সাড় ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে স্কুলে যান, ...''[১২৪] কারণ তিনি সারাদিনে দু ঘন্টার বেশি রান্নাতে সময় ব্যয় করেন না। তাই স্কুলে পড়ানো রান্না করা ছাড়াই সেলাই, বইপড়া সবই করার তিনি সময় পান।

সুবোধিনী তার নিজের নাম সুচরিতা নামটা ননীদিদিমণি দিয়েছে এবং সুবোধিনীর তার নিজের সেকেলে সুবোধিনী নামের বদলে আধুনিক সুচরিতা নামটা পছন্দ হয়েছে।

ন বছরের মেয়ের মুখে এত কথা শুনে পিতা রীতিমত আশ্চর্য হয়ে যান। এর কিছুদিন পর এক সৌখিন পরিবার তাদের বাড়ির পাশে ভাড়া নিয়ে থাকতে আসে। ঐ পরিবারের আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র মহিলার নিপুণভাবে সংসার করা দেখে এ বাড়ীর সুবোধিনী ও তার রীতিমত মুগ্ধ হয়। পাশাপাশি তার দ্বিতীয় ভাগ পড়া স্ত্রীর শুচি বায়ুগ্রস্ততার জন্য ছেলেদের অভুক্ত থাকা কিংবা সময়মত এক কাপ চা পানের অব্যবস্থা উপলব্ধি করে তিনি সুবোধিনীকে শেষপর্যন্ত স্কুলে ভর্তি করবেন বলে মনস্থ করেন। অথচ মাসিক পত্রে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাকে কষে গাল দিয়ে লেখা বন্ধ করেন না কারণ ''মনস্থ নামটাই তিনি শুনেছেন ও বস্তু দিয়ে কখনো চর্চা করেননি।''[১২৫]

‘প্রেম ও রেডিও’ — আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৩৪৫ শারদীয় সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিস্কার রেডিও, সেই রেডিওর প্রতি মানুষের আগ্রহ, প্রীতি নিয়ে হাস্যরসের মোড়কে গল্পটি পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। রেডিওর কী মারত্মক প্রভাব তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। যেমন আজকের যুগে টেলিভিশনের প্রভাব।

‘বন্যা’ — দেশ পত্রিকার ৬ বর্ষ ১ সংখ্যায় ১৯৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর এই গল্পটি প্রকাশিত হয়।

সাব-জজ হরকান্তবাবুর একমাত্র ছেলে বাইনা-তেইশ বছরের উমাকান্ত ফিলজফিতে এম.এ পাশকরে গবেষণা করছেন। এহেন দার্শনিক উমাকান্ত দার্শনিক প্রকৃতির দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আছে এমন মেয়ে যদি পায় তবেই বিবাহ করবে না পেলে নয়। তার এই অদ্ভুত মনোভাবে অভিভাবকেরা পাত্রী খুঁজতে নাকানি চোবানি খাবেন এতে আর সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে বাঙলা দেশে বন্যা দেখাদিল। উমাকান্তের বন্ধুবর্গ তাকে এসে বলল বন্যা ত্রাণে তাদের সঙ্গে বনাঞ্চলে রিলফ কেন্দ্রে যোগদান করতে যাওয়ার জন্য।

উমাকান্ত বন্ধুবর্গের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বের হন ঠিকই কিন্তু উমাকান্তর মাতার সঙ্গে অবিবাহিত বয়স্ক রসিক মানুষ সম্পর্কে এক দুঃসম্পর্কের কাকা অক্ষয়বাবুকে উমাকান্তর সঙ্গে পাঠালন। অক্ষয়বাবু সকলের সঙ্গে মিশে গেলেন। ট্রেনে যাওয়ার সময় অক্ষয়বাবু সহ অন্যান্য সকলের সাথে দেখা হল অজিতা মুখার্জ্জির যিনি কলেজের অধ্যাপিকা, দর্শন এবং সংস্কৃতে এম.এ। দর্শনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হয়েছিলেন। তিনিও সঙ্কট ত্রাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনে চলেছেন। এমন মেয়ের সন্ধান পেয়ে অক্ষয়বাবু ‘‘... মানুষের মন বশ বরিবার যতরূপ ফন্দী জানিতেন তাহার সমস্ত প্রয়োগ করিয়া সেই গর্ব্বিতা মেয়েটিকে বশ করিবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।’’[১২৬] এবং এতে ফলও হল খানিকটা। অজি তার কাকার বাড়ি ঐ অঞ্চলেই এবং তাই সে কাকার বাড়িতেই উঠবে।

সারাদিন বন্যাপীড়িতদের দেখে ক্লান্ত উমাকান্তকে নিয়ে অক্ষয়বাবু বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে অজিতার কাকার বাড়িতে আসে। সেখানে অজিতাকে দেখে উমাকান্ত অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করায় অক্ষয়বাবু আর ভরসা পেলেন না সেখানে চলে আসার জন্য তারা যখন উঠবেন এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় জল শুরু হল। অজিতার কাকা বাবু লোকটি খুবই সহৃদয় আড্ডাপ্রিয় মানুষ। অক্ষয়বাবুদের তিনি এই দুর্যোগের দিনে কিছুতেই যেতে দিলেননা ‘বিপদের সময়ে বিদেশে এমন আতিথ্য গ্রহণে সঙ্কোচের কিছুই নেই।’’[১২৭]

কথায় কথায় জানা যায় অজিতার কাকিমা মারাগেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত গৃহে, রাতের খাবারে, শয্যায় একটা নিপুণভাবে যত্নের ছোঁয়া অনুভব করা যায়। জানা যায় কাকুর একটি মেয়ে আছে তার নাম সুধীরা। রাত্রিবেলায় অজিতার সঙ্গে বন্যাত্রাণের বিষয় নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হল, দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হয়। কিন্তু এত তর্কাতর্কিতেও অজিতার কোন প্রভাব উমাকান্তের ওপর পড়ে না।

পরের দিন ভোর বেলায় উমাকান্ত ঘরের উঠোনে কাজ করতে দেখে ধীরাকে। পরকে আপন করতে, নিঃশব্দে সেবা করতে যে ধীরা অত্যন্ত পারদর্শী তার লেখাপড়া কতখানি সেটা তার পিতাও ঠিকঠাক জানে না। এরপর উমাকান্তের বিয়ে হল দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত অজিতার সঙ্গে নয় গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী মেয়ে ধীরার সঙ্গে। কারণ গৃহকর্ম-নিপুণা, সেবা পরায়ণা মেয়েকেই ঘরের বৌ করতে আগ্রহী হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানুষজন।

'সফলতা' - পাঠশালা ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'All works and no ply, makes Jack a dull boy' — এ কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় গল্পটিতে।

বিজয় নামের ছেলেটিকে তার পিতা হরসুন্দরবাবু টাকা পয়সা খরচ করে ভালোভালো মাস্টার দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। হরসুন্দর বাবুর ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা কাজেই তিনি ছেলের জন্য টাকা লুটিয়ে দিলেন। বিজয়ের মা রাজলক্ষ্মী দেবীও বিজয়ের পড়ায় অমনোযোগের কথা তার ছোট ভাই প্রশান্তকে বললে প্রশান্ত বিজয়ের জন্য একটা পাঠ্যবিষয়ক নিয়মাবলী তৈরী করে দেন যেখানে বিজয়ের খেলাধূলা কিংবা গল্পগুজব করবার কোন সময়ই থাকে না। একেবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার রুটিনে শুধুই পড়ালেখা এবং কিছু সময় মাস্টারদের জন্য বরাদ্দ। পরীক্ষার রেজাল্টের পর দেখা যায় বিজয় ফেল করছে।

এরপর বিজয় তার কাকার বাড়িতে কিছু দিনের জন্য থাকে। সেখানে তার অত পড়ার চাপ থাকে না। সে সেখানে বাগানেও ঘোরে, গান শোনে, গল্প করে আবার ভালো করে ঘুমাতেও পায়। তার কাকাতোদিদি তাকে গল্পের মধ্য দিয়ে পড়া বুঝিয়ে দেয় ফলে ধীরে ধীরে পড়াশুনোটা বিজয়ের কাছে চাপের নয় বরং হাল্কা ভালোলাগার জিনিষে পরিণত হয়।

'বিনিময়' — পাঠশালা, ১৩৪৬ বৈশাখে প্রকাশিত হয় আশালতা সিংহের এই গল্পটি।

ধনী ঘরের আদুরে ছেলে সারাক্ষণ আদর যত্নে থাকতে থাকতে তার প্রাণ হাপিয়ে ওঠে। শিশুমন

আনন্দ চায় তা বনভোজন হোক কিংবা গাছে চড়া কিংবা সাধারণভাবে সকলের সাথে মিলে মিশে খেলাধূলা করা। এসব না পেয়ে শুধু ঘরের মধ্যে থাকা কিংবা সুদৃশ্য গাড়ী করে বেড়াতে যাওয়া বা দামি খেলনা দিয়ে তাকে ঘরে বন্দী করে রাখলে সে হাপিয়ে উঠবেই। এমন ঘটনাই ঘটে অশোকের সঙ্গে। সে দুবার হাঁচি দিলে দশটা ডাক্তারকে কল করা হয়। কিন্তু এসকল প্রাচুর্যের মধ্যে না রেখে তাকে যদি সাধারণভাবে মানুষ করা হত তাহলে হয়তো তার পক্ষে অনেক মঙ্গল হতো।

'সুরের মায়া' - মাসিক বসুমতী ১৩৪৬ এর শ্রাবণ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।

আধুনিক সভ্য জগতের আজকাল ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে দেখে বুঝে মত জানাবে। আগেকার দিনে যেমন ছিল '...ঘটক এলো, পাত্রের সন্ধান দিলে, সব দিক্ দেখেশুনে ভালো দেখে মা বাপে একটা বেছে বিয়ে দিয়ে দিলে নিশ্চন্দি'[১২৮] । বর্তমান সময়ে আর সেসব সেকেলে প্রথা নেই কিন্তু ছেলেমেয়েও চটকরে কোন কিছু না বললে বাবা-মায়ের চিন্তার যেন শেষ নেই।

তাই মালতীদেবী তার মেয়ে অশোকাকে নিয়ে একটু চিন্তিত কারণ যতই আধুনিক হন মেয়ের বিয়ে সব ঠিক না হলে একেবারে চুপচাপ বসেও থাকতে পারছেন না। ইতিমধ্যে তার নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে। আজ যেমন তিনি মেয়ে অশোকার মনের কথা জানতে না পেরে ব্যাকুল হয়েছিলেন তেমনই একদিন মালতীদেবীর 'তরুণ মনের রহস্যঘন আলোছায়ার খেলা বুঝিতে উঠিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটতম আত্মীয়জনরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।'[১২৯] সংগীত প্রেমী আশালতা সুর-তাল-লয়েই জীবনকে দেখতে পছন্দ করতেন। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সুরের মায়ায় একদিন যেমন মালতীদেবী কমলবাবুর মিলন হয়েছিল তেমনি মেয়ে অশোকা এবং তার প্রণয়ী অজিতের মধ্যে মান অভিমান দূর হয়ে মিলনের পথ সুগম হয়। ছন্দ পতন, তাল ভঙ্গে যেমন সুরের ব্যাঘাত ঘটে তেমনি সুরের মুর্চ্ছনায় অনেক না বলা কথাও বলা হয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে সুরের মধুর মায়ায়।

'বিসর্জ্জন'— গল্পটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে আশালতা দেখাচ্ছেন অপূর্ব্ব লেখক। অপূর্ব্ব পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে উজ্জ্বয়িনী দেবীর দেখা পান। অপূর্ব্বর লেখায় উজ্জ্বয়িনী দেবী কান্ডজ্ঞানের অভাব খুঁজে পান, তাঁর মতে অপূর্ব্ব লেখায় বাস্তবতার দিকটি ফোটেনি। যদিও নিজের লেখা সম্বন্ধে অপূর্ব বলে —

''আমি চেয়েছি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে মানব মনের নানা অভীক্ষা, নানা ধরা ছোঁয়ার অতীত অনুভূতি। আমি তারই দিশারী। নাম নাজানা বেদনার পসারী।''[১৩০]

আশালতা নিজেও কি অপূর্ব্বর মতোই লিখতেন। কারণ তার গড়া নায়িকারা অনেকেই তৎকালীন সমাজ পরিবেশে যথেষ্ট প্রগতিশীল। তার প্রায় বেশিরভাগ নায়িকাই বেথুন কলেজে পড়ে, বড় বড় ইংরেজী বই, ইউরোপীয়ান মেয়েদের মত পাণিপ্রার্থীকে নিজে পছন্দ করে, ইত্যাদি।

যাই হোক এত বড় কড়া সমালোচিকাকে অপূর্ব্ব কেন বিয়ে করল তা জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে প্রত্যেক কাজে-কথায়-ব্যবহারে স্বামীর মতের সঙ্গে মত মিলিয়ে চলতে চায় তেমন মহিলাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় বলে উজ্জ্বয়িনী দেবীর মত মেয়েকেই তার পছন্দ হয়।

নিজের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসা যায়। এরপরে অপূর্ব্ব যখন তার স্ত্রী উজ্জ্বয়িনীর সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেয় তখন উজ্জ্বয়িনীর মুখেরর কথা শুনে অপূর্ব্বর বন্ধুরা অবাক হয়ে যায় কারণ উজ্জ্বয়িনীর কথামত ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে হুবহু নকল করছে তার স্বামী অপূর্ব্বকে। নিজস্বতা কখন যেন সে বিসর্জ্জন দিয়েছে। এমন ভালোবেসে নিজস্বতা বিসর্জ্জন দিলেও উজ্জ্বয়িনীকে অপূর্ব্বর বন্ধুরা নিন্দে করছে না। কারণ এমন মেয়েকে তো আমাদের সমাজের পুরুষেরা নিন্দে করে না। প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রথম থেকেই যদি কোন রমণী দেখান আর সে যদি শিক্ষিতা রুচিশীল হয়েও তা করেন তবে তো কথাই নেই।

'নবজীবন' — ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে আশালতা সিংহের নবজীবন গল্পটি পাঠশালা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রোগক্লিষ্ট অভাবী মা-কে একটু মিছরির সরবৎ দেবার জন্য হত দরিদ্র সন্তোষ এক ভদ্রলোকের পকেট কাটে এবং পুলিশের হাতে ধরা প'ড়ে তার কারাদণ্ড হয়। জেলের পাহারাদার রমারতন-এর সঙ্গে ভাব জমিয়ে সুযোগ মত তাকে আফিং খাইয়ে সন্তোষ জেল থেকে পালিয়ে যায়। রামরতন মাঝখান থেকে ফেঁসে যায়। এদিকে সন্তোষ জেল থেকে পালিয়ে পদ্মডোবা গ্রামে আশ্রয় নেয়। এখন সে এই গ্রামে চালের আড়তদার, তাঁতশালা, ধানের গোলা করেছে এবং তার আড়তে, তাঁত শালায়, ধানের গোলায় অনেক লোক কাজ করে। গ্রামে গরীবদের জন্য বিদ্যালয়, দাতব্য চিকৎসালয় এর ব্যবস্থাও সে করেছে।

বেশ কয়েকবছর এভাবে কাটলেও হঠাৎ একদিন ট্রেনের সেকেন্ড কামড়ায় রমতরনের সঙ্গে সন্তোষের দেখা হয়। রামরতনের জন্য সন্তোষের অনুশোচনা হয়। সন্তোষ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তার সমস্ত ব্যবসা এবং গ্রামের গরীব লোকেদের দায়িত্ব রামরতনের কাছে সমর্পণ করে সে পুলিশের কাছে ধরা দেবার মনস্থ করে। সন্তোষের এমন আচরণে রামরতন প্রথমে অবাক হলেও পরে, সে উপলব্ধি

করে ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বাস করেই মানুষকে শোধরানো সম্ভব, জেলেকঠিন কঠার শাস্তিতে কোন কাজ হয় না। রামরতন উপলব্ধি করে এখন থেকে তার নবজীবন আরম্ভ হল।

'ক্ষণকাল' —'অলকা'পত্রিকায় আশালতা সিংহের এই গল্পটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

অরুণিমা স্বামী বিজনের সঙ্গে শহরেই থাকে। পুজোর ছুটিতে এবার তারা দার্জ্জিলিং, সিমলা, শিলং না গিয়ে গ্রামে তাদের দেশের বাড়িতে যাবে মনস্থ করেন। বিশেষ করে অরুণিমা সেখানে কোনদিন যায়নি। যাবার আগে অরুণিমাঅবশ্য দর্জ্জি ডেকে একটা বড় নেটের মশারি বানিয়ে নেয়। নায়েব, গোমস্তাকে আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়, তারা তাদের সাধ্যমত সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কাজেই গ্রামে পৌঁছে অরুণিমাদের খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে কীর্ত্তনের প্রভাতী সুর অরুণিমার ভারী ভালো লাগে। গ্রামের প্রজাদের বিনম্র প্রভুভক্তিতে এবং গ্রামের কিছু মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করে তার মনে একটি নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়। তার কাছে গ্রামের মানুষের সুখ, দুঃখ আন্তরিকতা অত্যন্ত জীবন্ত রূপে ধরা দেয়। পল্লীবাংলার গৃহবধূর ওপর শাশুড়ীর নির্যাতন এবং অল্প বয়সী বধূটির স্বামীর প্রতি অনুরাগ, সামান্য সখ-আহ্লাদ তাকে বিস্মত করে।

স্বামী বিজন কিন্তু এসমস্ত থেকে শত হস্ত দূরে। সে জ্ঞানের জগতে বই খবরের কাগজ এসব নিয়েই ডুবে আছেন। স্ত্রীকেও বার্ট্রান্ড রাসেলের নতুন বইখানা পড়তে বলেন কিন্তু স্ত্রী অরুণিমা গ্রামের লোকজন, তাদের জীবনযাত্রা দেখে শুনে এতই ভাবুক হয়ে পড়েন যে বই পড়ার কথা তার খেয়াল থাকে না।

গল্পটিতে এত কিছু বর্ণনার মাঝে লেখিকা যা সরাসরি বলেননি তা হল পল্লীগ্রামের পরিবেশ, জীবনযাত্রা ক্ষণকালের জন্যই মনে দাগ কাটে, ভাবায়, খানিকটা ভালো লাগায় কিন্তু সেটা ঐ স্বল্প সময়ের জন্যই।

'কালো মেয়ে' — আশালতা সিংহের লেখা 'কালা মেয়ে' গল্পটি দেশ পত্রিকায় ৭ বর্ষ ১৯৪০ সালের ৬ ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। আশালতা সিংহ - এই নামে লেখিকার প্রকাশ হয়েছিল।

গল্পে দেখা যায় অরুণা নামের মেয়েটি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সে ভালো ছাত্রী, নম্র, বিনয়ী।, সকলের কাজও করে, পড়াশুনাও করে। যেখানে ছেলেরা শুধু নিজের পড়াটুকু করে সেখানে মেয়েরা

পড়াশুনার ফাঁকে বাড়ির লোকের নানান ফাই ফরমাশ খাটে, মা'কে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই অরুণার গায়েব রঙ অনুজ্জ্বল হওয়ায় তার বিয়ের ব্যাপারে মা-কাকিমা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাকে যেদিন দেখতে আসার কথা পাত্রপক্ষের সেদিন অরুণার স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, কাকিমা কাঁচা হলুদ বেঁটে তাকে বিশেষভাবে স্নান করান, রূপচর্চা করান।

অরুণার কাকিমা ও অপ্রসন্নভাবে বলেন —'...ইস্কুল ইস্কুল করেই গেলে মা। ইস্কুলে পড়ে কি জজ মেজিষ্টর হবে না টাকা রোজগার করতে হবে তোমাকে?'[১৩১]

অরুণা তার খুড়তুতো বোনের কাছ থেকে জানতে পারে ভবানীপুরের ইন্দ্রবাবুরা শিগগির কনে দেখতে আসবেন। তাই সবাই অরুণাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অরুণার খুড়তুতো বোন রমাকে পাঠকের মনে হতে পারে সে হয়তো নির্লজ্জের মতো তার বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী, লজ্জা যেখানে মেয়েদের ভূষণ —

এর জবাব যেন শুনতে পাই লেখিকার বকলমে রমারই মুখে —

> ''বিয়ে কোথায় হবে, কেমন জায়গায় হবে তারই উপরে মেয়েদের সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে। জানতে ব্যগ্রতা হবে না?''[১৩২]

বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে অরুণার মনেও যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না তা কিন্তু নয়, তার গায়ের অনুজ্জ্বলতার জন্যই সে সর্বদা সঙ্কুচিত, অথচ রমার কথায় জানতে পারি অরুণার মত সুন্দর মুখশ্রী, গানের এমন গলা, ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছে কটা মেয়েই বা পাওয়া যায়।

'রহস্যভেদ' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা একমাত্র রহস্যগল্প 'রহস্যভেদ' গল্পটি ১৯৩৮ সালে আন্দাজ পাবলিশার্স থেকে সিদ্ধার্থ ঘোষ ও রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তবে প্রথম কবে এবং কোথা থেকে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটা জানা যাচ্ছে না।

পান্নালাল অ্যান্ড মণিলাল জুয়েলারী দোকানের ম্যানেজার গ্রামের জমিদার রমাকান্ত বাবুর দুই ছেলেরর বিয়ে উপলক্ষে কোলকাতা থেকে দামি দামি জুয়েলারীর নমুনা দেখাতে এনেছিলেন। ম্যানেজার কোলকাতার লোক, এ অঞ্চলের পথ-ঘাট তেমন চেনেন না। জমিদার বাড়িতে কাজ সারা হলে জমিদার বাবু ম্যানেজারকে গোরুর গাড়িতে করে স্টেশনে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ম্যানেজার বাবু ভেবেছেন তিনি একাই স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন ধরে কোলকাতা যেতে অসুবিধা হবে না। কাজেই জমিদারের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করেছেন। কিন্তু বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলেও ম্যানেজার ঐ মফঃস্বল শহরে স্টেশনে

যাবার রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। সামনে একটি পরিচ্ছন্ন ছোট সুদৃশ্য বাড়ি দেখতে পেয়ে সেখানেই এগিয়ে যান। বাড়ির মালিক শৈলেন চৌধুরী। শৈলেনের বাড়িতে ম্যানেজার কিছুক্ষণের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন।

এই শৈলেন খুন, ডাকাতি, চুরি প্রভৃতি সমস্ত অপকর্ম করলেও তাকে কেউ ওপর থেকে দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না। শৈলেনের একমাত্র চাকর রঘুবীর আর কেউ নেই তার সংসারে। রঘুবীর ঐ দিন হাট করতে দূরে গেছিল। শৈলেন ঐ দিন কোলকাতায় যাবে। শৈলেন ম্যানেজারকে বলে যে সে-ও কোলকাতায় যাবে কাজেই তার সঙ্গে গেলে ম্যানেজারের রাস্তা চিনতে অসুবিদা হবে না।

ম্যানেজার শৈলেনের বসার ঘরে বসলে শৈলেন পেছনে থেকে শাবলের বাড়ি দিয়ে ম্যানেজারকে আঘাত করে এরপর মুখে টেবিল ক্লথ গুঁজে তাকে হত্যা করে। ম্যানেজারের বাক্স খুলে সে দেখে তার অনুমান মিত্যে নয়। নানান দামি গহনা রত্নে ব্যাগ ভর্তি।

এরপর স্টেশনে লাশ অন্ধকারে টেনে নিয়ে এসে রেল লাইনে উপুর করে ফেলে দেয়। যাতে লোকে ভাবে লোকটি আত্মহত্যা করেছে।

কিছুক্ষণ পরে স্টেশনে সকালে যখন ঐ লাশকে কেন্দ্র করে হৈ চৈ করেছে তখন ঐ স্টেশনে জমিদারবাবুর ছেলে বাণীকান্ত ছিল।

বাণীকান্ত যে ট্রেনে রাধানগর আসছিলেন সেই একই ট্রেনের একই কামরায় তার ডাক্তার বন্ধু বিমানবিহারীও আসছিল। এই বিমানবিহারী ডাক্তার হলেও সে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবেও খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তারা যখন রাধানগরে পৌঁছলেন সেখানে ঐ লাশকে কেন্দ্র করে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে লোকজনের মধ্যে।

বাণীকান্ত, বিমান বিহারী এবং তার সেক্রেটারি রামপ্রসাদ তিনজনেই মৃতদেহটাকে দেখার জন্যে স্টেশনের লাশ ঘরে যান এবং বাণীকান্ত চিনতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি তাদেরই বাড়িতে জুয়েলারী দেখাতেত এসেচিলেন কারণ কোলকাতার জুয়েলারীর দোকানে ঐ ম্যানেজারকে তিনি দেখেছিলেন। এরপর বাণীকান্তের অনুরোধ বিমান বিহারী খুনের তদন্তে নামেন।

লাশের মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে দেখেই বিমানবাবু বোঝেন যে লোকটিকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। এরপর খুব নিপুণভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিমান খুনের কিনারা করেন এবং খুনীকে ধরতে সমর্থ হন।

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য সূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ

১) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'নিরুপম', 'আশালতা সিংহের গল্প সংকলন ১', ভূমিকা তপোব্রত ঘোষ সংকলন অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩, এবং স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ১১৭

২) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'স্বাধীনতা ও সম্মান', পৃ. ১২৩, তদেব

৩) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'অন্তর্দ্ধান', পৃ. ১২৯ তদেব

৪) দ্র. আশালতা সিং ঃ 'পরাজয়', পৃ. ১৭৬, তদেব

৫) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'প্রেমে পড়া', পৃ. ২১০, ঐ

৬) দ্র. তদেব, পৃ. ২২৫

৭) দ্র. তদেব পৃ.

৮) দ্র. তদেব পৃ. ২২৬-২২৭

৯) দ্র. তদেব পৃ.

১০) দ্র. তদেব পৃ.২২৪

১১) আশালতা সিংহ, 'অপমান', ঐ, পৃ. ২৩০

১২) দ্র. তদেব পৃ.২৪০

১৩) দ্র. তদেব পৃ.২৪০

১৪) দ্র. তদেব পৃ.২৪০

১৫) দ্র. তদেব পৃ. ২৪০

১৬) দ্র. আশালতা সিংহ, রমা, ঐ পৃ. ২৬০

১৮) দ্র. তদেব পৃ. ২৬১

১৯) দ্র. তদেব পৃ. ২৬৪

২০) দ্র. তপোব্রত ঘোষ লিখিত ভূমিকা, পৃ. ৫৫, অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী সংকলিত 'আশালতা সিংহের গল্প সংকলন ১', ২০০৬

২১) দ্র. আশালতা সিংহ, 'আশঙ্কা', পৃ. ৩২০ ঐ

২২) দ্র. তদেব পৃ. ৩১১

২৩) দ্র. তদেব পৃ. ৩২১

২৪) দ্র. আশালতা সিংহ, 'দেশের কাজ', পৃ. ৩২৭ ঐ

২৫) দ্র. তদেব পৃ. ৩২৮

২৬) দ্র. আশালতা সিংহ, 'নতুন রেশ', পৃ. ৩২৮, তদেব।

২৭) দ্র. তদেব পৃ. ৩৪৬

২৮) দ্র. আশালতা সিংহ, 'তরুণ প্রতিবেশী', পৃ. ৩৫৭, ঐ

২৯) দ্র. তদেব পৃ. ৩৫৯

৩০) দ্র. তদেব পৃ. ৩৫৯

৩১) দ্র. আশালতা সিংহ, 'সুখবাদ', পৃ. ৩৬০ ঐ

৩২) দ্র. আশালতা সিংহ, 'সুখবাদ', পৃ. ৩৬১ ঐ

৩৩) দ্র. তদেব পৃ. ৩৬৩

৩৪) দ্র. তদেব পৃ. ৩৭০

৩৫) দ্র. আশালতা সিংহ, 'পত্র পরিচিতা', পৃ. ৩৭৩

৩৬) দ্র. তদেব পৃ. ৩৭৬

৩৭) দ্র. আশালতা সিংহ, 'ভালো লাগা', পৃ. ৩৮৯, ঐ

৩৮) দ্র. আশালতা সিংহ, 'সুরমার সংযম', পৃ. ৩৯২, ঐ

৩৯) দ্র. তদেব পৃ. ৩৯৩, ঐ

৪০) দ্র. তদেব পৃ. ৩৯৪

৪১) দ্র. আশালতা সিংহ, 'নারী চরিত্র', পৃ. ৪১২, ঐ

৪২) দ্র. তদেব পৃ. ৪১৯

৪৩) দ্র. তদেব পৃ. ৪২০

৪৪) দ্র. আশালতা সিংহ, 'মঞ্জুরীর বেহায়াপনা', পৃ. ৪২৮, ঐ

৪৫) দ্র. আশালতা সিংহ, 'প্রভাতের অশ্রুজল', পৃ. ৪৪৯, ঐ

৪৬) আশালতা সিংহ, 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম', পৃ. ৪৭২

৪৭) দ্র. আশালতা সিংহ, 'গবেষণা', পৃ. ৪৯৩, ঐ

৪৮) দ্র. তদেব পৃ. ৪৯৯

৫০) দ্র. আশালতা সিংহ, 'পছন্দের জের', পৃ. ৫১২, ঐ

৫১) দ্র. তদেব পৃ. ৫১৩

৫২) দ্র. তদেব পৃ. ৫১৮

৫৩) দ্র. আশালতা সিংহ, 'ছ'বছর পরে', পৃ. ৫২৫

৫৪) দ্র. তদেব পৃ. ৫২৭

৫৫) দ্র. তদেব, পৃ. ৫২৯

৫৬) দ্র. আশালতা সিংহ, 'লগন বয়ে যায়',

৫৭) দ্র. আশালতা সিংহ, 'জানালা', 'আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২', সংকলন - অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৯৩

৫৮) দ্র. তদেব পৃ. ৯৪

৫৯) দ্র. আশালতা সিংহ, 'বেদনার বিভিন্নতা', তদেব পৃ. ৯৪

৬০) দ্র. তদেব পৃ. ৯৫

৬১) দ্র. তদেব পৃ. ৯৫

৬২) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বাণীর নেশা’, তদেব, পৃ. ৯৬

৬৩) দ্র. তদেব পৃ. ৯৬

৬৪) দ্র. তদেব পৃ. ৯৭

৬৫) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘পূর্ব্বাপর’, তদেব পৃ. ৯৮

৬৬) দ্র. তদেব পৃ. ৯৯

৬৭) দ্র. তদেব পৃ. ৯৯

৬৮) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘কাসুন্দি’, তদেব পৃ. ১০২

৬৯) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘এপিঠ-ওপিঠ’, তদেব পৃ. ১০৪

৭০) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘নবযুগ’, তদেব, পৃ. ১০৮

৭১) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘কাব্যমন্ডল’, তদেব পৃ. ১১০

৭২) দ্র. তদেব পৃ. ১১০

৭৩) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘স্বপ্নদেখা’, তদেব পৃ.১১২

৭৪) দ্র. তদেব পৃ. ১১৩-১১৪

৭৫) দ্র. তদেব পৃ. ১১৪

৭৬) দ্র. তদেব পৃ. ১১৪

৭৭) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘প্রশ্নপত্র’, তদেব, পৃ. ১১৪

৭৮) দ্র. তদেব পৃ. ১১৫

৭৯) দ্র. তদেব পৃ. ১১৫

৮০) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘স্বপ্নের অর্থ’, তদেব, পৃ. ১১৭

৮১) দ্র. তদেব পৃ. ১১৮

৮২) দ্র. তদেব পৃ. ১১৮

৮৩) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বদলে’, তদেব পৃ. ১২১

৮৪) দ্র. তদেব পৃ. ১২১

৮৫) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বিয়ের পর’, তদেব, পৃ. ১২২

৮৬) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘পূর্ব্বরাগ’, তদেব, পৃ. ১২৬

৮৭) দ্র. তদেব পৃ. ১২৬

৮৮) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘নীর ও ক্ষীর’, তদেব, পৃ.১২৯

৮৯) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘রূপান্তর’, তদেব পৃ. ১৩৭

৯০) দ্র. তদেব পৃ. ১৩৮

৯১) দ্র. তদেব পৃ. ১৩৮

৯২) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘মধুচন্দ্রিকা’, তদেব পৃ. ১৪৩

৯৩) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বুদবুদ’, তদেব, পৃ. ১৫৯

৯৪) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘কনে দেখা’, তদেব পৃ. ১৬৭

৯৫) দ্র. তদেব পৃ. ১৬৭

৯৬) দ্র. তদেব পৃ.১৬৮

৯৭) দ্র. তদেব পৃ. ১৭১-১৭২

৯৮) দ্র. তদেব পৃ. ১৭৩

৯৯) দ্র. তদেব পৃ. ১৭৪

১০০)দ্র. তদেব পৃ. ১৭৩

১০১)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘ননীদি’, তদেব, পৃ. ১৯৪

১০২)দ্র. তদেব পৃ. ১৯৫

১০৩)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বিনাপণের মর্যাদা’, পৃ. ১৯৭

১০৪)দ্র. তদেব পৃ. ২০১

১০৫)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘তৃষ্ণা’, তদেব পৃ. ২০৩

১০৬)দ্র. তদেব পৃ. ২০৫

১০৭)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘চির নবীন’ — পৃ. ২১৩

১০৮)দ্র. তদেব পৃ. ২০৮

১১০)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘সাধনার ফল’, তদেব, পৃ. ২২১

১১১)দ্র. তদেব পৃ. ২২১

১১২)দ্র. তদেব পৃ. ২২৪

১১৩) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘স্বরূপ’, তদেব, পৃ.

১১৪) দ্র. আশালতা সিংহ, ‘নূতন প্রথা’, পৃ. ২৩৭

১১৫)দ্র. তদেব পৃ.

১১৬)দ্র. তদেব পৃ.

১১৭)দ্র. তদেব পৃ.

১১৮)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বান্ধবী’, তদেব, পৃ.

১১৯)দ্র. আশালতা সিংহ , ‘মা’, তদেব, পৃ. ৫৯

১২০)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘অতিথি’, তদেব পৃ. ২৬০-২৬১

১২১)দ্র. তদেব, পৃ. ২৬১

১২২)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘প্রতিক্রিয়া’, পৃ. ২৬৬

১২৩)দ্র. তদেব, পৃ. ২৬৮

১২৪)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘মনস্তত্ত্ব’, পৃ. ২৭০

১২৫)দ্র. তদেব, পৃ. ২৭১

১২৬)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বন্যা’, তদেব, পৃ. ২৭৩

১২৭)দ্র. তদেব, পৃ. ২৭৩

১২৮)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘সুরের মায়া’, তদেব, পৃ. ৩০১

১২৯)দ্র. তদেব, পৃ. ৩০২

১৩০)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘বিসর্জ্জন’, তদেব, পৃ. ৩০৭

১৩১)দ্র. আশালতা সিংহ, ‘কালো মেয়ে’, তদেব, পৃ. ৩২২

১৩২)দ্র. তদেব, পৃ. ৩২৩